

মন কেমন করে



বিমল মিত্র

নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড



প্রথম প্রকাশ—কার্তিক, ১৩৬৫
নভেম্বর, ১৯৫৮

প্রকাশক
জে. এন. সিংহ রায়
নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ
২২, ক্যানিং স্ট্রীট
কলিকাতা-১
প্রচ্ছদপট
অজিত গুপ্ত
মুদ্রক
রণজিৎকুমার দত্ত
নবশক্তি প্রেস
১২৩, লোয়ার সারকুলার রোড
কলিকাতা-১৪

তিন টাকা পঞ্চাশ নয়াপয়সা

উৎসর্গ

ফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রীতিভাজনেষু—

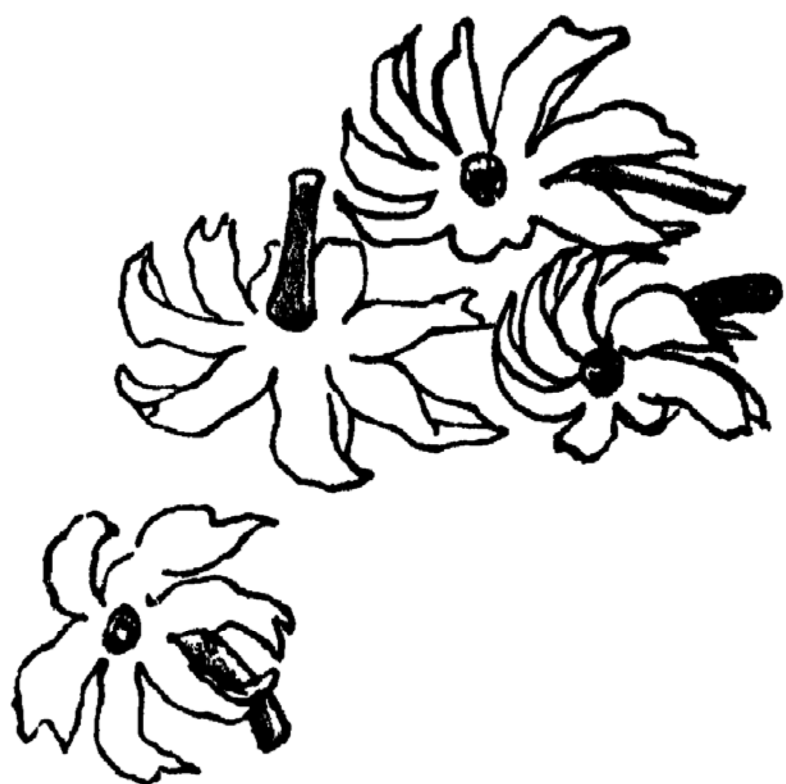
Ah, my brother, hast thou never seen
a virtue backbite and stab itself?
—Nietzsche.

লেখকের অন্যান্য বই

সাহেব বিবি গোলাম

মিথুনলগ্ন

মন কেমন করে



MON KEMAN KARE

A Novel

by

Bimal mitra

কোথা থেকে শুরু করবো! কার কথা আগে বলবো? কোথাকার কথাই বা বলবো? ছোট-ছোট টুকরো কথার আর টুকরো ছবির ছায়া সব। সবাই একসঙ্গে চোখের ওপর ভিড় করে সমস্ত ঝাপ্‌সা করে দেয়।

পরজীবনের কথা জানি না, পরজীবন আছে কি না তা-ও বলতে পারি না। ইহজীবনটা তো দেখছি। এ দেখা হয়তো কোনওদিন শেষও হবে না। কিন্তু সংসারে অনেকদিন বেঁচে থেকে, অনেক জিনিষ দেখে শুনে একটা কথাই শুধু আজ বুঝতে পেরেছি যে, কিছুই আমার বোঝা হয়নি। কিছুই আজো বুঝতে পারিনি।

সেই যেদিন ১২।২এফ্ বলাই স্যুর বাই-লেনের বাড়িটা থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলাম, মনে হয়েছিল কে যেন আমার পিঠে সপাং সপাং করে চাবুক মেরে ছেড়ে দিয়েছে। আর সেদিন? সেদিন যখন বৌবাজার স্ট্রীটের ধারে অর্জুন এসে আমায় ডাকলে, আমায় ডেকে নিয়ে দাঁতের ডাক্তারখানার সামনে গেল, তখনও আমি ভালো করে বুঝিনি যে বুঝতে তখনও আমার অনেক বাকি! এই বুঝতে পারা আর বুঝতে শেখার হয়তো কোনও দিনই আমার শেষ হবে না। আমি ভালো করেই জানি যেদিন ইহজীবনের সব সম্পর্ক ঘুচিয়ে চলে যেতে হবে সেদিনকার সে শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত আমার সব বোঝার খেসারত কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দিয়ে যেতে হবে!

বললাম—তারপর?

এটি জেনে রাখো এই তারপরেরও আর শেষ হবে না কোনও দিন। যে বলে অনেক দেখেছি অনেক জেনেছি, আর আমার দেখবার জানবার কিছু নেই, সে হয় ভুল বলে নয়তো মিছে কথা বলে। কেন, তবে শোনো:

জীবনে এমন কথা অনেক আছে যা নিজের স্ত্রীকেও বলা যায় না। আজ আশে-পাশে কেউ নেই, কারো শোনবার সুবিধেও নেই, এই-ই সুযোগ। আজ তোমাদেরই বলি। ছেলেবেলায় অনেক কথা ভেবেছি, অনেক জিনিষ দেখেছি

সেই দেখা আর ভাবার মধ্যে অনেক লজ্জা অনেক কামনা লুকিয়ে আছে, যা কাউকে এখনও বলিনি, বলতে পারিনি ; এমন কি নিজের স্ত্রীকেও না। জানি না তোমরা শুনে কী বলবে।

আজ আমার বয়েস হয়েছে অনেক। এখন আমাকে যে চোখে দেখছো, যা দেখছো, আমিও আসলে তা নই। এই দাড়ি গোঁফ, এই চশমা, এই ভারিক্কি চেহারা, এই গাড়ি বাড়ি ঐশ্বর্য এর পেছনেও তোমাদেরই মতো একটা মানুষ আছে জেনো। তোমাদেরই মতো তার লোভ মোহ রাগ অনুরাগ ছিল। তার একটা কাহিনীও ছিল। সেই কাহিনীই তোমাদের আজ বলছি :

আজ থেকে উজান বেয়ে যদি সেই পুরনো দিনগুলোতে ফিরে যাওয়া যায় তো দেখা যাবে বাদামতলার বড় রাস্তাটা পেরিয়ে একটা ছোট গলি। সেই গলিটা ওদিকের শেতলাতলায় গিয়ে মিশেছে।

ওদিকে গিয়ে আর নেই। আমাদের বাদামতলার ওখানেই শেষ। শুরু হয়েছে উত্তরে কালিঘাটের পুল থেকে। তারপর কাঠের গোলা পেরিয়ে, বাজার পেরিয়ে সোজা দক্ষিণ দিকে চলে যাও। কেবল গলি আর কেবল গলি। গলির যেন গোলক-ধাঁধা। সকাল বেলা আপিসে যাবার সময় গলিগুলো থেকে হুড়হুড় করে লোক বেরিয়ে আসে। মধ্যেখানে হাট। বাদামতলার হাট। কাঁহা দিল্লী, কাঁহা বেনারস, সেখানেও বাদামতলার হাটের সুনাম। কাটা কাপড়ের জামা, ফ্রক, শার্ট, কামিজ, কত দূর-দূর দেশে চালান যায়। শনিবারে চিঁড়ে-মুড়ির হাট আর মঙ্গলবারে জামা-কাপড়ের হাট। হপ্তায় দু'দিন। হাটের দিন গরুর আর মোষের গাড়ির গাদি লেগে যায় রাস্তায়। দক্ষিণ থেকে মেয়েরা বস্তা-বোঝাই চিঁড়ে নিয়ে আসে। কিছু কিছু আসে ডোঙা-নৌকোতে। আগের রাত্রে লম্ফ জ্বালিয়ে ভাত রাঁধে, কাছি দিয়ে বড় বড় অশথগাছের গুঁড়িতে বাঁধে নৌকোগুলো। এমন একটা নয়, অনেক। কদমফুলি, সোনারগাঁ, কুদঘাটা, কত দূর দূর দেশ থেকে আসে। তারপর সওদা বেচে শনিবারের হাট করে রাত থাকতে থাকতে আবার রওনা দেয়। তখন গঙ্গায় খালি খড়ের নৌকো। দোতলা-তিনতলা সমান খড় বোঝাই। তার ভেতরে ছোট একটু গর্ত। সেখানেই মাথা গুঁজে পড়ে থাকে

রাতের বেলা সবাই। ঘাটে নৌকো লাগতেই মাথায় খড়ের তড়পা নিয়ে দলে দলে বেরিয়ে পড়ে ব্যাপারীরা।

—খড় নেবে গো, খড় চাই!

গলির ভেতরেই আসল খদ্দের। বাদামতলার পাড়ায় পাড়ায় খড় বিক্রি করতে আসে ব্যাপারীরা। এ-গলি পেরিয়ে ও-গলি। কলাবাগান, কাঁঠালিবাগান, খয়রাপটি, শেতলাতলা। কত সব নাম! আলিপুরের কাছারি-আদালতে যারা কাজ করে, বাদামতলার হাটে যারা জামা-কাপড়ের ব্যবসা করে, চাল-ডাল, গামছা, বঁড়শি আর শাঁখা-সিঁদুরের কারবার করে, তারাই থাকে এই এই সব গলির মধ্যে। আর কিছু-কিছু ভদ্রলোক। কেরানী গোছের ভদ্রসন্তান। সকালবেলা সওদাগরি আপিসে পান চিবোতে চিবোতে যায়, আর ফেরে সন্ধ্যেবেলা। জেলেপাড়ার গা ঘেঁষে পেল্লাদ চৌধুরীর বিরাট বাড়ি। পেল্লাদ চৌধুরীর বাড়ির পাশে বিরাট একটা বাদামগাছ। বাদামতলা নাম হলো কেন কে জানে! ওই বাদামগাছের তলায় শেকড়ের ওপর বসে বসে কতদিন দুপুরবেলা লুকিয়ে লুকিয়ে মাছ ধরেছি ছিপ নিয়ে। আর দরোয়ান এলেই দূর-দূর করে পালিয়ে গিয়েছি, ভোলাদের বাড়ির উঠোন ভেঙে বুড়োশিবতলার কাঁঠালি-চাঁপার বাগান পেরিয়ে একেবারে নাগালের বাইরে। ওখানেই ছিল সুরেশ্বরীদিদির বাড়ি। যখন দুপুরবেলা চুপি-চুপি সুরেশ্বরীদিদিদের বিলিতী আমড়াগাছে উঠেছি, উঠোন থেকে সুরেশ্বরীদিদি চিৎকার করে উঠেছে, কে রে, কে ওখানে—?

সুরেশ্বরীদিদির শ্বশুর ঘরের ভেতর থেকে বলতো—কে বৌমা? ও কে?

সুরেশ্বরীদিদির শ্বশুর ছিল অন্ধ। চুপচাপ ঘরে বসে থাকতো আর টিকটিক করতো সারাদিন। বলতো—বৌমা, আজ কি একাদশী নাকি গো?

সুরেশ্বরীদিদি রান্না করতে করতে উত্তর দিতো—হ্যাঁ।

—তা হলে আমার জন্যে আর মাছ করো না বৌমা; মুগের ডাল ভাতে দিও আর দুটো গাছের কাঁচা লঙ্কা হলেই আমার চলে যাবে। আমার আজকে খিদে নেই।

কিন্তু খানিক পরেই বলতো—কাদের বাড়ি মাংস রান্না হচ্ছে বুঝি বৌমা, বেশ গন্ধ বেরোচ্ছে—

তখন বাদামতলায় ইলেকট্রিক আলো হয়নি। ভাঙা পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে দেখতাম বাড়ির রোয়াকে বসে সুরেশ্বরীদিদি একমনে হাঁটুর কাপড় তুলে সলতে পাকাচ্ছে, আর পাশে শ্বশুর বসে বসে বকবক করে চলেছে।

বলছে—তোমার শাশুড়ী বড়ি দিয়ে একরকম নিরিমিষ ঝোল করতো জানো, তেমন রান্না আর খেলুম না—

সুরেশ্বরীদিদি জানলা দিয়ে দেখতে পেলে এক-একদিন ডাকতো।

বলতো—কী রে, কোথায় ছিলিস ক'দিন?

তারপর বলতো—তোর জন্যে একটা ঘুড়ি ধরে রেখেছি—

কোনও দিন ঘুড়ি, কোনও দিন লাট্টু, কোনও দিন পাটালি গুড়, আবার কোনও দিন কুলের অম্বল। সুরেশ্বরীদিদির হাতের রান্না ছিল খুব ভালো। এক-একদিন কোনও নিরিমিষ রান্না ভালো করে তৈরি করলে জানলা দিয়ে চেয়ে দেখতো। বলতো, —কালকে এলি না, তোর জন্যে মটরডালের বড়া ভেজেছিলাম—

শ্বশুর জিজ্ঞেস করতো—হ্যাঁ বৌমা, ও কাদের ছেলে গো?

দিদি বলতো—মিত্তিরদের।

—বটুক মিত্তিরের নাতি বুঝি? এককালে ওদের খুব বোলবোলা ছিল গো। সেই লোহার গেটটা আছে এখনও ওদের?

বটুক মিত্তির এ-পাড়ার আদি বাসিন্দে। যখন বাদামতলা এমন ছিল না, তখন আমার ঠাকুর্দা কাছারির নাজির হয়ে এসেছিলেন এখানে। চারটে পুকুর আর ছত্রিশ বিঘা জমিতে বাগানবাড়ি করে এখানকার বাস পত্তন করেন। তারপর বটুক মিত্তিরের মৃত্যুর পর বড় জ্যাঠামশাই সব উড়িয়ে উড়িয়ে যখন আর বেশি বাকী রাখেন নি, তখন আমার জ্যাঠা-কাকারা আলাদা হয়ে গেলেন। যে-যার আলাদা হয়ে গেল। পাশাপাশি বাড়ি সব। কাকা জ্যাঠা বাবা। খুড়তুতো জাঠতুতো ভাইরা এক চৌহদ্দির মধ্যে ঘোরাফেরা করি। এক মাস্টারের কাছে পড়ি, আর একই ইস্কুলে লেখাপড়া করি। কিন্তু খাওয়া-শোওয়া আলাদা। আমরা যদি খাই লুচি, খুড়তুতো ভাইরা রুটি, আর

জাঠতুতো ভাইরা পরোটা। রাত্তির বেলাটা আলাদা বাড়িতে শুই বটে, কিন্তু ভোর হতে-না-হতে সব ছেলেরা পড়তে বসি এক মাস্টারের কাছে। কিন্তু বয়েস হবার সঙ্গে সঙ্গে কেমন করে যেন বুঝতে পারলাম যে, আমি আলাদা। আলাদা সংসারের আলাদা ছেলেই শুধু নই, আমার সঙ্গে কারও মেলে না। আমি যা চাই, তা কেউ দিতে চায় না, দিতে পারে না। আমার চাওয়ার রকম ধরন সবই আলাদা। আমার বাগানে গোলাপ গাছে ফুল ফুটলে সে-গোলাপ হয়ে ওঠে সোনার গোলাপ, তাতে কারও হাত দেওয়া চলবে না। আমার পোষা পায়রা যদি চৌধুরীদের ছাদে উড়ে যায় তো সে আমার পায়রার দোষ নয়, দোষ চৌধুরীদের ছাদের। সব জিনিসকে স্বতন্ত্র করে অধিকার করে একলা ভোগ করবার স্পৃহা আমার ছোটবেলা থেকে। তাই সুরেশ্বরীদিদিকেও বেশিদিন ভালো লাগেনি। সুরেশ্বরীদিদি তো আমার একলার নয় শুধু, তার অন্ধ শ্বশুরেরও যে।

—বৌমা, কার সঙ্গে কথা বলছ গো ? কে ও ?

দিন নেই রাত নেই, কেবল বৌমা আর বৌমা ! অন্য বৌমা হলে কী করতো জানি না, কিন্তু সুরেশ্বরীদিদির যেন বিরক্তি বলে কোনও জিনিস থাকতে নেই।

বলতাম—তোমার শ্বশুর আগে ঘুমোক, তখন আসবো।

সুরেশ্বরীদিদি হাসতো।

বলতো—উনি কিছু বলবেন না, তুই আয় না—

বলতাম—তোমাকে কেন সারাদিন খাটিয়ে মারে তোমার শ্বশুর ?

সুরেশ্বরীদিদি বলতো—বুড়ো মানুষের সেবা করলে পুণ্যি হয়, তা জানিস ?

বলতাম—তোমার কী পুণ্যি হচ্ছে ? সারাদিন তো খেটেই মরছ।

সুরেশ্বরীদিদি হাসতে হাসতে বলতো—দেখবি আর জন্মে আমার খুব সুখ হবে।

শেষ পর্যন্ত জীবনে কি কোন সুখই পায়নি সুরেশ্বরীদিদি ? যখন নিজে নিজেদের সংসারেও পর হয়ে বাস করছি, যখন আমাদের বাড়িতেও কোথাও শান্তি পাইনি, তখন একটু আদরের লোভে

একটু মিষ্টি কথার লোভে সুরেশ্বরীদিদির বাড়িতে গিয়ে তৃপ্তি খুঁজেছি। তৃপ্তি কি সুরেশ্বরীদিদিরই ছিল! একখানা কি দু'খানা কাপড়, তাই হয়তো সাজিমাটি কেচে শুকিয়ে পরেছে। তারপর অন্ধ শ্বশুরের সেবা করেছে প্রাণপণে।

শ্বশুর হয়তো বলেছে—বৌমা, বড্ড শীত করছে, একটু রোদে বসিয়ে দাও না গো—

রাঁধতে রাঁধতে হাত ধুয়ে শ্বশুরকে রোদে বসিয়ে এসে আবার শ্বশুরের খাবার করতে বসেছে। তারপর আমি যেতেই হয়তো হাসিমুখে কাছে বসিয়েছে। বলেছে—আজকে কী দিয়ে ভাত খেয়েছিস রে?

বলতাম—তুমি আজকে কালীঘাটে পুজো দিতে যাবে না সুরেশ্বরীদিদি?

সুরেশ্বরীদিদি বলতো—আমার আবার পুজো! পুজো আমার মাথায় উঠেছে—

সত্যিই পুজোপাঠ, বিধবার অনুষ্ঠান যা-কিছু, সেসব করবার সময় সুরেশ্বরীদিদি পেতো না। যখন নীলের উপোষের দিন সবাই শেতলাতলায় গিয়ে ঠাকুরের মাথায় জল দিয়ে এসেছে, কেঠে কাপড় পড়ে নৈবেদ্যের রেকাবি নিয়ে চরণামৃত হাতে করে বাড়ি ফিরেছে, কিংবা বারুণী পুজোর দিন গঙ্গার ঘাটে গিয়ে মাথায় আম নিয়ে ডুব দিয়ে এসেছে, পাড়ার বউ-ঝি-বিধবাদের উৎসবের অনুষ্ঠানের আনন্দের অবধি নেই, তখন সুরেশ্বরীদিদির বাড়ি গিয়ে অন্য চেহারা দেখেছি। শ্বশুরের ময়লা নোংরা কাপড় কলতলায় বসে হয়তো পরিষ্কার করছে, নয়তো এক কাঁড়ি বাসন নিয়ে মাজতে বসেছে, কিংবা শ্বশুরকে রোদে বসিয়ে স্নান করাচ্ছে।

পাড়ার অন্য বাড়িতে অন্য বাড়ির গিন্নীরা যখন খেয়ে উঠে ছাতের রোদে চুল শুকোচ্ছে, কিংবা ঘরের মেঝেতে দরজা বন্ধ করে গড়িয়ে নিচ্ছে, তখন শ্বশুরকে খাইয়ে-দাইয়ে শুইয়ে রান্নাঘর সারতে বসতো। উনুনে মাটি লাগাতো, গোবর লাগাতো, লোহার ঝিঁক ভেঙে গিয়েছে, তাই লাগাতে বসতো। একবালতি গোবর-জল নিয়ে নিকোতে বসতো রান্নাঘর। উবু হয়ে বসে হাত লম্বা করে সারা মেঝে থেকে শুরু করে আধখানা দেয়াল পর্যন্ত

গোবর লেপতো। তারপর উঠোনের গোড়া থেকে তুলসীতলা পর্যন্ত চারপাশে গোবর লেপে লাউগাছের মাচার তলায় হাতটা ধুয়ে ফেলে গায়ের আঁচলটা সামলে নিতো।

বলতাম—এইবার খেয়ে নাও সুরেশ্বরীদিদি, বেলা যে অনেক হলো—

সুরেশ্বরীদিদি তখন ঝাঁটাটা নিয়ে বলতো—দাঁড়া, এখন খাবো কী রে, এখনও কত কাজ—

সত্যিই খুব কাজের মেয়ে ছিল সুরেশ্বরীদিদি। অথচ কতটুকুই বা সংসার, আর কী-ই বা কাজ! ভাঙা একটা পুরনো ইটের বাড়ি, অর্ধেক তার ভেঙে পড়েছে, আর নিচু একতলা দু'কোঠাওয়ালা একটা ভাঙা দালান। সিমেন্টের মেঝে ভেঙে গর্ত হয়ে গিয়েছে। মাঝে মাঝে আবার নর্দমা দিয়ে সাপ বার হতো।

বলতাম—সাপ বেরলে তুমি কী করো সুরেশ্বরীদিদি?

সুরেশ্বরীদিদি বলতো—ওই দেখ না, দুটো মোটা মোটা লাঠি রেখে দিয়েছি—

সাজতে কখনও দেখিনি সুরেশ্বরীদিদিকে। আমার মা যে অত সংসার বলতে অজ্ঞান, তাকেও এক-একদিন খাওয়া-দাওয়ার পর পান-জর্দা খেয়ে কেমন যেন সেজেছে মনে হতো। আমাদের বাড়ির পুরনো ঝি পাঁচির মা, সে-ও এক-একদিন চুল বেঁধে তেল-চক্‌চকে হয়ে আসতো, দাঁতে মিশি দিতো, গলায় হার পরতো। পাড়ার রাস্তা দিয়ে চলতে কত বাড়ির বউ-ঝিদের তো দেখেছি। বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে গিয়ে তাদের মা মাসি বোনদের দেখেছি। বাদামতলার অধিবাসীদের কেউই এমন কিছু রাজা-উজির নয়। দিন আনে দিন খায়। সোনার বেনেদের বাড়ির মেয়েদেরই একটু সাজ-গোজ ছিল বেশি। তারা বেল-কুঁড়ি খোঁপায় গুঁজতো পায়ে আলতা দিতো, পাছাপাড় শাড়ি পরতো, কানে ঝুমকো পরতো। কিন্তু সাধারণ বাড়ির মেয়েদেরও কিছু এমন কম ছিল না। সায়া-সেমিজ এখনকার মতো তখন চলতি ছিল না। কিন্তু সাবান ছিল, পায়ে ঝামা-ঘষা ছিল। ময়দা দিয়ে গা-ঘষা ছিল। মাথা-ঘষা ছিল। মাথার চুল নিয়ে নানান রকমের বিনুনি ছিল। আমার জাঠতুতো বোনরা বিবি-খোঁপা বাঁধতো। পাতা কাটতো। কপালে খয়েরের টিপ

আর কাঁচপোকার টিপ দিতো। চুল-বাঁধার বাক্সই ছিল আলাদা। এক-একজন চুলের গোড়ায় ফাঁস বেঁধে দাঁত দিয়ে চেপে ধরতো। আর পেছনে বসে জ্যাঠাইমা পরিপাটি করে চুল বেঁধে দিতো। এক-একটা করে মেয়ে চুল বাঁধতো আর দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতো, আর বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হতো। তারপর সেজেগুজে ছাদে গিয়ে সব বেড়াতো। এ-বাড়িতে ও-বাড়িতে এ-পাড়াতে ও-পাড়াতে যোগাযোগ ছিল মেয়েদের মধ্যে দিয়ে। বাদামতলার মাঠে যাত্রা হলে চিকের আড়ালে গিয়ে বসতো মেয়েরা, এ-ওর গয়না দেখতো, চুলবাঁধা দেখতো, শাড়ি দেখতো, আর পরের দিন বাড়ি-বাড়ি পরস্পরের শাড়ি-গয়না-চুল বাঁধার গল্প হতো।

বলতো—মা গো, গণেশ দত্তর ছোট মেয়ে কী সেকেলে গয়না পরে এসেছিল মাঐমা, কী বলবো—

ছোট বোন বলতো—আর বেনারসী শাড়ি দেখেছিলে ন'দিদি —ও ঠিক মার বিয়ের বেনারসী পরে এসেছে—

মেজকাকা বলতো—তা তোরা কি যাত্রা শুনতে গিয়েছিলি, না গনেশ দত্তর ছোট মেয়ের গয়না দেখতে গিয়েছিলি শুনি?

এখনকার মতো জুতো পরার রেওয়াজ তখন হয়নি মেয়েদের। ব্লাউজ, বডিস্‌ও হয়নি। ছিল সেমিজ। একেবারে শায়া ব্লাউজ দু'কাজই হতো। বাদামতলায় মেয়ে-ইস্কুল একটা ছিল বটে। কৃষ্ণভামিনী বালিকা বিদ্যালয়। এককালে এক ধনী বিধবা কিছু বুঝি টাকা দিয়েছিলেন। দিদিরা সেই স্কুলে পড়তে যেত। আট-দশ বছর, কি বড়জোর বার বছর। তারপরই বিয়ে হয়ে যেত বাদামতলার মেয়েদের। ইস্কুলের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচে যেত তাদের। কারও বিয়ে হতো হরিনাভিতে, কারও বেগমপুরে, কারও বেলডাঙাতে। পুরুত নাপিত নিয়ে বর আসতো বিয়ে করতে। সে-ক'দিন যে কী আনন্দ! যার বিয়ে তার মনে কী হতো কে জানে! আমাদের কিন্তু ঘুম ছিল না। সকাল থেকে উঠে খেলা। কেউ বকবার নেই, পড়তে বসা নেই। অঙ্কের খাতার পাত্তাই নেই। কেবল খাওয়া আর দৌড়োদৌড়ি। আমাদের সব বাড়ির ছেলেরা তখন একাকার হয়ে গিয়েছে। আলাদা হাঁড়ি আবার তখন দু'তিনদিনের জন্যে এক হয়ে

গিয়েছে। তারপর যেদিন বর কনে চলে যাবে, সেদিন কী কান্না ন-দিদির। জোর করে ঠেলে ঘোড়ারগাড়িতে তুলে দিতে হবে। ছোটকাকা কাঁদবে, ছোটকাকীমা কাঁদবে। আর জ্যাঠামশাই, বাবা ব্যবস্থা করবে, হাঁকডাক করবে!

তারপর আবার সব আলাদা। আবার সব ফাঁকা। আর কাক-চিলের ভিড় নেই, ঘি তেলের গন্ধ নেই। আবার বাবা আপিসে যেতেন। ন-দিদির শ্বশুরবাড়ি থেকে তত্ত্ব আসতো। আর সত্যিই আবার একদিন ন-দিদি এসে হাজির ঘোড়ার গাড়ি চড়ে। এখানে বাপের বাড়িতে এসে ছেলে হতো। মেয়ে হতো। তারপর একদিন কাকীমার মতো গিন্নীবান্নি হয়ে উঠতো। মোটা হয়ে উঠতো। তখন আর আসতো না।

বটুক মিত্তিরের বংশের ধারা এমনি করে অনেক দূরে গড়িয়েছে। যারা পেরেছে, তারা অনেক দূরে দূরে চলে গিয়েছে। কিন্তু যারা যেতে পারেনি তারই এখানে গুঁতোগুঁতি করে থেকেছে। এ-বাড়ির এঁটো ও-বাড়িতে ফেলেছে কাক, এ-বাড়ির গেঞ্জি ও-বাড়িতে উড়ে গিয়ে পড়েছে। মনোমালিন্য তাতে বেড়েছে দিন দিন। ও-বাড়ির ঠিকে-ঝি ও-বাড়ির ভাঁড়ার ঘরের খবর চুপি চুপি দিয়ে গিয়েছে এ-বাড়িতে, আর তাই নিয়ে অন্দরমহলে বারমহলে বিপ্লব ঘটে গিয়েছে, আবার নিঃশব্দে থেমেও গিয়েছে।

এমনি করে যখন বাড়িতে বাড়িতে প্রীতি-ভালোবাসা রেশারেশি-ঘৃণা-হিংসার ঝড় বয়ে চলেছে, যখন মেয়েদের গয়না, বিয়ে, যাত্রা, সব কিছু নির্বাহ হয়ে গিয়েছে নির্বিঘ্নে, অন্য দিকে ইতিহাসের চাকা সমানভাবে আপনার কাজ চালিয়ে গিয়েছে। রাস্তা খুঁড়ে ইলেকট্রিক আলো, জলের কল, পাকা নর্দমা সব নিঃশব্দে শুরু হয়ে গিয়েছে। আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তা খোয়া-ঢাকা ছিল। একদিন তা পিচ-ঢাকা হলো। হ্যারিকেন-গুলো কুলুঙ্গিতে জমা হয়ে তাতে ধুলো জমতে লাগল। বাদামতলার রাস্তায় গ্যাসের বাতি ছিল, ইলেকট্রিক আলো বসলো সেখানে। চেহারা বদলে গেল কিছুটা আমাদের পাড়ার। কিন্তু সুরেশ্বরীদিদির বাড়ির চেহারা যেমন ছিল তেমনই রইল।

এমনি করেই হয়তো চলতো সুরেশ্বরীদিদির সংসার আর সুরেশ্বরীদিদির জীবন।

চারিদিকে যখন চেহারা-বদলের ইতিহাস চলছে, তখনও সুরেশ্বরীদিদির বাড়িতে যে অনড় অচল জীবন তেমনি জলুসহীন হয়ে থাকবে, তাতে আশ্চর্য হবার কী আছে। বাড়িটার দেয়ালের সাত-পুরু শ্যাওলার মতন সুরেশ্বরীদিদির মনেও যে শ্যাওলা জমবে, তা-ই বা বিচিত্র কী! কিন্তু আমারও অজ্ঞাতে কখন সে-বাড়ির চেহারা, রঙ, এমন কি আদলটাই বদলে একেবারে ইতিহাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে শুরু করেছে, তা আমিও টের পাইনি।

অবশ্য আমার তখন টের পাবার বয়েস নয়।

সুরেশ্বরীদিদি তখন আমার কাছে একটা নামগোত্রহীন আকর্ষণ ছাড়া আর কিছু নয়। চারিদিকের রঙ-বদলের মধ্যে অজর অমর হয়ে সুরেশ্বরীদিদি আমাকে কখন কেমন করে যেন আপনার করে রেখেছিল! জানতাম, যেখানে যা হোক, যেখানে যতকিছু বদলাক, এখানে এই সুরেশ্বরীদিদির কাছে ভেজাল নেই। যখন বাড়িতেও আর মন টেকে না, যখন ফুটবল খেলার নাম করে খেলার মাঠেও আর যাই না, তখনও জানতাম ও-বাড়িতে ওই সুরেশ্বরী-দিদির কাছে আমার নিমন্ত্রণ বাঁধা। চরকির মতো সংসারের ঘানিতে ঘুরে ঘুরে যত ক্লান্তিই আসুক, আমার জন্যে সুরেশ্বরীদিদির হাসিটুকু ঠিক জমানো আছে। আমার জন্যে কুলের আচার, আমার জন্যে ঘুড়ি, আমার জন্যে লাট্টু, যেখানকার যা-কিছু কুড়োনো জিনিস, সব ঠিক আছে। আমি গেলেই হাত না-পাততেই পেয়ে যাব।

কিন্তু এমনি অন্ধ ছিলাম আমি যে, একদিন যখন আমার সব প্রাপ্য নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল, সেদিন আমি দুঃখ পেয়েছিলাম যতখানি, অবাক হয়েছিলাম তার চেয়েও বেশি।

আমার চরিত্র এমনি করেই গড়ে উঠেছে, আজ বুঝতে পারি। যেখানে অনেক বেশি আশা করি, পাওনার অংশে আমি সেখানেই বেশি ঠকি। আজ বুঝি, এ আমার পাওয়ার দোষ নয়, চাওয়ার দোষ।

সুরেশ্বরীদিদি জিজ্ঞেস করলে—ক'দিন আসিসনি যে?

বললাম—ন-দিদির বিয়ে ছিল—

ন-দিদির বিয়েতে পাড়ার আর পাঁচটা পরিবারের সঙ্গে সুরেশ্বরীদিদির কেন যে নেমন্তন্ন হতো না, তা বুঝতে পারতাম না তখন। কিন্তু লক্ষ্য করতাম, এ-পরিবারটিকে পাড়ার লোক বাতিল বলেই ধরে নিয়েছে। পাড়ার পাঁচজনের আওতার মধ্যে যেন এরা পড়ে না। এরা এ-পাড়ায় আছে যেন বাহুল্যভাবে। থাকবার অধিকার এদের নেই, না সংখ্যাধিক্যে, না অর্থকৌলীন্যে! কিন্তু আকর্ষণও ছিল আমার ঠিক সেই কারণেই। যেখানে অনেক স্নেহের ভিড়, সেখানে স্নেহ-ভালোবাসা নিয়ে কাড়াকাড়ি করা আমার ধাতে সয় না। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে আমি কখনও নেই। সুরেশ্বরীদিদির স্নেহের জগতে তাই আমার ছিল সহজ আধিপত্য। আমি ওখানে ছিলাম সম্রাট। তাই অহঙ্কারও যেমন ছিল আমার, তেমনি ছিল শাসন। শাসনটার প্রকাশ ছিল আমার অদ্ভুত। যখন ভীষণ যেতে ইচ্ছে করছে সুরেশ্বরীদিদির কাছে, তখনই বেশি করে নিজের মনের রাশ টেনে ধরতাম। বাড়ির কাছে গিয়েও বাড়ির ভেতরে যেতাম না। পাশ কাটিয়ে চলে যেতাম যেখানে আমার যেতে নেই। চলে যেতাম, বাদামতলার একেবারে শেষ প্রান্তে। একেবারে কালীঘাটের রেল-স্টেশনের ধারে, কাটা-খালের আশে-পাশে, বুনো ঝোপ্ আর সিগন্যাল তারের পথ ধরে ধরে অনেক দূর। মন কিন্তু তখন পড়ে রয়েছে সুরেশ্বরীদিদির কাছে, আর আমি চলেছি, ফাঁপা শরীরটা নিয়ে বাদামতলা ছাড়িয়ে বহুদূর। অথচ কী যে তার প্রয়োজন, তা হয়তো আমিই জানি না।

কিন্তু ওই যে ক'দিন না গেলেই সুরেশ্বরীদিদি বলবে—ক'দিন আসিসনি যে,—ওইটুকুর প্রলোভন। ও কি সামান্য প্রলোভন! যদি রোজ গেলে পুরানো হয়ে যাই! হয়তো রোজ গেলে আর কুলের আচার খেতে বলবে না!

তখন কি জানি যে, আমিও একদিন বড় হবো, আমারও বয়েস হবে, ওই আকর্ষণও একদিন হাস্যকর তুচ্ছ ঠেকবে আমার কাছে। আর সব চেয়ে বড় কথা, অমন যে সুরেশ্বরীদিদি, যাকে অক্ষয় অব্যয় ভেবেছিলাম, যাকে কেউ কেড়ে নিতে পারে না ভেবেছিলাম, যার স্নেহ-ভালোবাসা সব আমাকে পেয়েই তৃপ্ত হয়েছিল ভেবেছিলাম, সে-ও এমন করে……

কিন্তু সে-কথা এখন থাক!

সব কথা তো জানি না। সব কথা তো জানতে পারা যায় না। আর মানুষ নিজেকেই কি সম্পূর্ণ জানতে পারে! না, জানা সম্ভব? তবু মনে হতো, দেখা হলে একবার জিজ্ঞেস করবো, এ তুমি কেমন করে করতে পারলে সুরেশ্বরীদিদি?

পাড়ার সব মেয়েমহলে যখন ছি-ছি রব উঠলো, তাদের ছি-ছির সঙ্গে নিজের গলা যে সেদিন, মেলাতে পারিনি সে কেবল বিশ্বাসের অভাবেই। আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। যাকে ভালো করো জেনেছি বলে বিশ্বাস করি, তার সম্পর্কে একদিন হঠাৎ সে-জানা যদি ধূলিসাৎ হয়ে যায়, তা হলে বিশ্বাস করবই বা কী করে।

মনে আছে সুরেশ্বরীদিদি একদিন হঠাৎ বলেছিল,—কাল এখানে তোর নেমন্তন্ন বুঝলি—

বললাম—কীসের নেমন্তন্ন?

সুরেশ্বরীদিদি বলেছিল,—এমনি—

সেদিন সেই নেমন্তন্নর কোনও কারণ বলেনি সুরেশ্বরীদিদি। হঠাৎ নেমন্তন্নর কারণ আমিও কিছু বুঝতে পারিনি। কিন্তু আমিও কি বুঝতে চেয়েছিলাম নেমন্তন্নর সেই অর্থ! শুধু কি খাওয়া! শুধু কি মাংস, মাছ, মাছের কালিয়া, সন্দেশ, রাবড়ি, দই! আমারই যেন কেমন লজ্জা করতে লাগল। আমাকে এত খাতির করবার দরকারই বা কী! আর খাওয়ার আগে সেই কোঁচান ধুতি, সেই গেঞ্জি, সেই সিল্কের পাঞ্জাবি!

বললাম,—অনেক টাকা খরচ হয়ে গেল তোমার। কেন এত খরচ করতে গেলে মিছিমিছি?

টাকা যে সুরেশ্বরীদিদিদের নেই, তা আমি জানতাম। নইলে বাড়ি সারানো হতো, নইলে সুরেশ্বরীদিদি ফরসা শাড়ি সেমিজ পরতো। ঠাকুর-চাকর রাখতো। নিজের হাতে বাসন মেজে মেজে অমন হাজা হতো না হাতে।

সুরেশ্বরীদিদি কিন্তু মুখে কিছু বললে না, শুধু হাসলে।

তারপর বললে,—আজ তো সবে মাসের সাতুই, বাবার পেনশন পেয়েছি তো পয়লা—

বললাম,—কিন্তু জামা-কাপড় দিতে গেলে কেন, আমার তো আছে।

সুরেশ্বরীদিদি গলা নামিয়ে বললে,—চুপ চুপ, ও-ঘরে বাবা আছেন, শুনতে পাবেন—

হঠাৎ অন্ধ শ্বশুর পাশের ঘর থেকে চেঁচিয়ে উঠলো, —বৌমা, ও কার গলা শুনতে পাচ্ছি গো—

সুরেশ্বরীদিদি বললে,—ওই বটুক মিত্তিরের নাতি—

বুড়ো বলতো,—এককালে ওদের খুব বোলবোলা ছিল গো। সেই লোহার গেটটা আছে এখনও ওদের? খাঁটি ইস্পাত একেবারে। হাতুড়ি মেরে ভাঙা যায় না, এত শক্ত। একবার ওদের বাড়িতে চোর এসেছিল, জানো বৌমা···

বুড়োর স্মৃতিশক্তিও অদ্ভুত! অন্ধদের বুঝি ঘ্রাণ-শক্তি স্মৃতি-শক্তি সবই সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশি! তবু নিজের অক্ষমতায় নিজেই যেন বারবার ভেঙে পড়তো। পেনশন নেওয়া ছিল এক সমস্যা। ডাক্তারের সামনে বসে সই করতে হতো কাগজে। তারপরে একদিন অনেক ঘটা করে সুরেশ্বরীদিদিকে নিয়ে গাড়ি ভাড়া করে পেনশন আনতে যেতে হতো। সুরেশ্বরীদিদি নিজে সতেরো টাকা পেনশন গুনে তুলে রাখতো।

শ্বশুর বলতো,—টাকাটা ভালো করে ক্যাশবাক্সোয় তুলে রেখেছ তো বৌমা?

বৌমা বলতো—রেখেছি বাবা।

—চাবি দিয়েছ?

বৌমা বলতো,—দিয়েছি।

—তালাটা টেনে দেখেছ তো?

বৌমা আবার বলতো,—দেখেছি।

তবু বুড়োর সন্দেহ যেত না। বলতো,—জানো বৌমা চোরেদের বুদ্ধি খুব—

এ-কথার উত্তর বৌমা দিতো না। বৌমা তখন কাজে ব্যস্ত। কিন্তু শ্বশুরের তখন গল্প করার মেজাজ। গল্প করতে পেলে বড় আনন্দ। কিন্তু গল্প শোনবার মানুষ ওই একটি মাত্র। ও-ঘরে বৌমার তখন সারাদিনের পরিশ্রমের পর চোখ দুটো বুজে আসছে।

বুড়ো গল্প করতে করতে বলে,—ঘুমুলে নাকি বৌমা?

সুরেশ্বরীদিদি বলে,—না।

—তবে শোন, সে কী কাণ্ড, ডাকাত পড়েছে শুনে আমরা তো ছুটে গেলাম সবাই, হৈ হৈ শব্দ শুনে পাড়ার লোক জেগে উঠেছে। সেকালের নায়েবির টাকা, মিত্তিররা তখনও ফারাক হয়নি। বিরাট চৌহদ্দি বাদামতলার পুবদিক পানটায়, সবই তো বাঁশের ঝাড়, সেই ঝাড়ের ওপারে গঙ্গা, ডাকাতরা গঙ্গা পার হয়ে এসেছে—

তারপরেই আবার সন্দেহ হয়। বলে,—বৌমা ঘুমোলে নাকি?

সুরেশ্বরীদিদি তখনও বলে,—না।

—তবে শোন—

বুড়োর রাতে ভালো ঘুম হয় না। সন্ধ্যেবেলা যেটুকু ঘুম হয় তাতেই চলে যায়। সারা রাতই উসখুস। কোথায় যেন শব্দ হলো না? ও কিসের শব্দ? কে যেন ডাকলে? এমনি নানা অব্রান্তর অস্বস্তিকর প্রশ্ন।

মাঝরাত্রে হঠাৎ বুড়োর খেয়াল হয়। বলে—টাকাটা কোথায় রেখেছ বৌমা?

সতেরো টাকার ভাবনায় অশান্তির শেষ থাকে না অন্ধ শ্বশুরের। চোরের বড় উৎপাত চারদিকে, বুদ্ধিও ওদের খুব। নিঃশব্দে সব সরিয়ে নিয়ে যায়। এমনি চালাক। রাত্রে চোরের শব্দ আর দিনের বেলায় রান্নার গন্ধ! কাদের বাড়ি কে জিরে-ফোড়ন দিয়ে কী রাঁধছে, হিং-এর সম্বরা দিচ্ছে নিরামিষ তরকারিতে, তার সন্ধান রাখতে হবে সুরেশ্বরীদিদিকে!

বলে,—তোমার শাশুড়ী নিরিমিষ রাঁধতে পারতো ভালো, জানো বৌমা—

সুরেশ্বরীদিদি বলতো,—আজকে চালকুমড়ো এনেছে কাশীর মা—রেঁধে দেবো অখন—

বুড়ো সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে ওঠে,—না বৌমা, আমি অনেক খেয়েছি, সাধ মিটিয়ে খেয়েছি, তোমার শাশুড়ী আমায় খুব খাইয়েছে, আমার আর খাবার সাধ নেই বৌমা, তুমি বরং খাও—

তারপর হঠাৎ মনে পড়ে যায়।

বলে,—চাল-কুমড়োর মেঠাই খেয়েছ বৌমা? চাল-কুমড়োর একরকম মিষ্টি করে হিন্দুস্থানীরা, খেয়েছ তুমি?

স্বরেশ্বরীদিদি বলে,—আপনি খাবেন তো কিনতে দিই কাশীর-মাকে—

বুড়ো হাঁ হাঁ করে ওঠে।

—না না, বৌমা, আমার কিছু দরকার নেই, আমার খাওয়ার সাধ পরার সাধ সব মিটিয়ে গিয়েছে তোমার শাশুড়ী। যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন, সংসারের ছিরিই ছিল অন্য রকম। তিনি খাটতেও পারতেন খুব, তাঁর স্বাস্থ্যও ছিল তেমনি, একদিনের তরে ডাক্তার ডাকতে হয়নি, আমার একটা পয়সাও খরচ হয়নি তাঁর অসুখ-বিসুখে। এখনকার ছেলেমেয়েদের একটু খাটুনি হলেই···

তারপর যেন নিজেই সামলে নেয়।

বলে,—তা স্বাস্থ্য থাকবেই না বা কেন, বলো! তোমরা কীই বা খেতে পাও! আমরা খাঁটি দুধ-ঘি খেয়েছি, ভালো চাল খেয়েছি, সে-সব চালই আজকাল খেতে পাই না—

স্বরেশ্বরীদিদির বাড়ির পেছনেই ছিল একটা মস্ত বাঁশঝাড়। তার পাশে ছেলেদের একটা খেলার মাঠ। মাঠের কোণে একটা শিশুগাছ। আমরা ওই গাছের ডাল কেটে ডাং-কড়ে তৈরি করতাম। ভারী হাল্কা আর শক্ত। শীতকালে ছুটির দিনে তিন চারটে দল হয়ে যেত একই মাঠের মধ্যে। খেলতে খেলতে যখন বেলা হয়ে যেত অনেক, বাড়ির লোকেরা ডাকতে আসতো। ভোলার দিদি ছিল সব চেয়ে বেশি দজ্জাল মেয়ে। পাড়ার লোকেরা বলতো রাখাল ঘোষের ওই মেয়েই বাপকে খাবে। খুন্তিদি বলতো,—এই ভোলা, আয় বলছি, শিগগির বাড়ি আয়—

ভোলা তখনও খেলছে। খুন্তিদির কথা শুনতে পায়নি। খুন্তিদি সোজা এসে আমার কান ধরেছে। বললে,—লেখাপড়া নেই তোর? কেবল খেলা?

বললাম,—বা রে, আমি কী করলাম?

—আমি কী করলাম? তুই-ই তো ভোলাকে ডেকে আনিস? তুই-ই তো ভোলাকে খারাপ করে দিচ্ছিস—

সত্যিই, অপরাধটা আমার। আমিই যখন-তখন গিয়ে ভোলাকে ডেকে ডেকে আনি। তিন চারটে ছিপ ছিল ভোলার বাবার। আমার ছিল সেই ছিপের লোভ। যখন দুপুরবেলা

সবাই ঘুমোচ্ছে, সবাই গরমে আইঢাই করছে, তখন আমি বাড়ি থেকে লুকিয়ে বেরিয়ে পড়তাম। মা তখন রান্নাঘরের পাট সেরে হয়তো দোক্তা দিয়ে পান খেয়ে উত্তরের ঘরে শুয়ে চোখ বুজেছে, বাবা আপিসে। সেই সময়ে চুপি চুপি দরজাটা খুলে একেবারে বেনেদের পেয়ারা গাছটার তলা দিয়ে বাইরের রাস্তায়। রাস্তায় এসে সামনে তুষপুকুর। তুষপুকুরের উত্তর দিকের সরু রাস্তাটা গিয়েছে গয়লাদের বাড়ির দেয়াল ঘেঁষে। সেই সরু রাস্তাটা যেখানে শেষ হয়েছে, তার মুখেই ভোলাদের বাড়ির সামনে একটু মাঠমতন। একটা বেলগাছ আছে মাঠের উপর। তারপর বেলগাছের তলা দিয়ে গিয়ে ভোলাদের বাড়ির পিছনের দিকে শোবার ঘরে গিয়ে ডাকতে হয়। একটু টের পেলেই খুন্তিদি জানতে পারবে। আস্তে আস্তে জানলায় টোকা দিই গিয়ে,—ভোলা, এই ভোলা—

ভোলা ভিতর থেকে জানলা খুলে বলে,—দাঁড়া, যাচ্ছি—

তারপর দুটো ছিপ নিয়ে আসে বাইরে। বলে,—খুন্তিদি ঘুমিয়েছে, আর একটু হলেই আমায় দেখতে পেতো।

বললাম,—চার এনেছিস ?

ভোলা বললে,—আজকে ময়দার সঙ্গে একটু ঘি. মাখিয়ে এনেছি, আজকে মাছ যা টপাটপ খাবে—

ভোলাদের বাড়ির পুবদিকে মল্লিকদের মস্ত বড় পুকুর। পুকুর যারা জমা নেয়, তারা মাছ ছাড়ে। যখন ছাড়ে তখন ছোট ছোট ডিম। তিরিশ-চল্লিশজন লোক বাঁকে করে মাটির হাঁড়িতে ডিম ভর্তি করে নিয়ে আসে। বাঁকে করে নিয়ে আসে আর নাচায়। হাঁড়ির জলের ভিতর ডিমগুলো ভাসে। জল না নাচলে ডিমগুলো মরে যায়। সকাল বেলা পুকুরের ধারে যখন সবাই সার-সার হাঁড়ি বসিয়ে রাখে, আমরা গিয়ে দেখি। ডিমগুলো চোখে দেখা যায় না এত ছোট। কিন্তু সেই ছোট ছোট ডিমগুলোই আবার একদিন কবে জলের ভিতর বড় হয়ে ওঠে জানতে পারি না। একদিন ভোরবেলা একদল লোক জাল ফেলে পুকুরে। পুকুরের এ-পাশ থেকে ও-পাশে ঘিরে জাল টানতে থাকে। দু'পাশে কয়েকজন লোক জাল টানতে টানতে এগোয়, আর মাঝখানে কয়েকটা খালি হাঁড়ি শুধু ভাসতে ভাসতে এগিয়ে যায়। আর সঙ্গে বাঁধা জালটাও এগিয়ে চলে। তারপর দু'পাশের

লোকগুলো এগিয়ে পুকুরের এপাশে এসে মুখোমুখি দাঁড়ায়। তখন জোরে জোরে দু'হাত দিয়ে টানতে থাকে জালটাকে। জালটাকে যত কাছে টানে, তত ছোট হয় পরিসর। তারপর যখন খুব কাছে চলে আসে জালটা, তখন মাছগুলো কিলবিল করে ওঠে। তারপর লাফায়। জাল ডিঙিয়ে পালাবার চেষ্টা করে। সাদা সাদা রুপোলী মাছ। রদ্দুর লেগে চকচক করে গা। মনে হয় যেন আকাশের তারাগুলো কেউ এক জায়গায় ধরে জড় করেছে। মনে হয় হাত দিয়ে ছুঁই। পোনার চারা। নিরীহ মাছ সব।

—ওই দেখ্ একটা হেলে সাপ।

—কই রে?

অতগুলো মাছের সঙ্গে একটা হেলে সাপও উঠে এসেছে। লতিয়ে লতিয়ে পাক খাচ্ছে আর এদিক-ওদিক পালাবার চেষ্টা করছে।

ভোলা বলতো,—ওই সাপগুলো মাছ খায়, জানিস?

কিন্তু জেলেদের ভয় নেই। একটা চুবড়ি দিয়ে সাপটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় জালের বাইরে। আর সাপটা এক নিমিষে এঁকে-বেঁকে জলের ওপর দিয়ে দূরে পালিয়ে যায়। আমি তখনও সাপটার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছি। পানা-ভর্তি পুকুর। ওদিকে জেলেপাড়ার দিকে গোবিন্দ সরকার রোড, আর এদিকে পেল্লাদ চৌধুরীদের বাড়ির রোয়াকে আমরা। প্রকাণ্ড পুকুর। শীতের শেষের দিকে জল শুকিয়ে পাড়টা অনেক উঁচু হয়ে যায়। পেল্লাদ চৌধুরীদের বাড়ির পশ্চিমে আমরা লাট্টু খেলি। কখনও লাট্টু খেলতে খেলতে লাট্টু গিয়ে পড়ে পুকুরের জলে। পুকুরের জলে নামতে সাহস হয় না। তখন ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে লাট্টুটাকে আবার পাড়ের কাছে আনি। আমাদের বাড়ির হাঁসগুলো চরতে আসে এই পুকুরে। সারাদিন কেবল ভাসে জলের ওপর, আর মাঝে মাঝে ডুবে যায়, ডুবে ডুবে গেঁড়ি খায়। তারপর যখন সন্ধ্যে হয়, তখন নিজেরাই ডাঙায় উঠে আসে, রাস্তা দিয়ে দৌড়তে দৌড়তে এসে বাড়ির ভেতরে ঢোকে।

মা বলে,—হ্যাঁ রে, সব হাঁসগুলো এসেছে তো? দেখি—

ছোট ছোট হাঁসের বাচ্চা কিনে প্রথম-প্রথম পুকুরে গিয়ে পায়ের সঙ্গে দড়ি বেঁধে দিয়ে আসতাম। যত লম্বা দড়ি, ততদূর

ভেসে বেড়াতে পারে। তারপর সন্ধ্যে হবার আগে হাঁসগুলোকে নিয়ে আসতে হয়। কিন্তু বড় হবার পর আর দড়ি বাঁধতে হয় না। তখন আপনিই পথ চিনে আসতে পারে। এসে নিজের ঘরে ঢোকে।

—হ্যাঁরে, সেই খয়েরী হাঁসটা তো আসেনি, কোথায় গেল দেখ্ তো?

বললাম,—আমি যাব মা?

মা বললে—তুই একলা পারবি দেখতে? জেলেপাড়ায় একবার গিয়ে জিজ্ঞেস কর দিকিনি—

বললাম,—আমি এখ্খুনি যাচ্ছি—

আর বলা-কওয়া নেই। আমি তখন বাড়ির সদর-দরজা পেরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়েছি। বাড়ির সামনেই একটা গ্যাসের আলো। তখন সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে, গ্যাস জ্বেলে দিয়েছে। বাড়ির সামনের রাস্তাটা এক দৌড়ে পার হয়ে বাদামগাছের তলাটায় গিয়ে দাঁড়ালাম। ওখানে গ্যাসের আলো হয়নি। অন্ধকার-অন্ধকার। চৌধুরীদের বাড়ির রোয়াকে ওঠবার মুখেই একটা তেলের বাতি। টিম্ টিম্ করে জ্বলছে। ডান দিকে কলাবাগান লেন, পেছনে পেল্লাদ চৌধুরীদের পেল্লায় বাড়িটা, বাঁ ধারে জেলেদের বস্তি, সামনে দক্ষিণে গোবিন্দ সরকার রোড, তার ওপারে আর একটা পুকুর, তার ওপারে শেতলাতলা, আর তার ওপারে আর কিছু দেখা যায় না। কেবল অন্ধকার। ত্'-একটা ছিটে-ফোঁটা আলো শুধু আর ছায়া-ছায়া অন্ধকার। দূরে কালীঘাট রেল-ইস্টিশান থেকে ইঞ্জিনের বাঁশি শোনা গেল একবার। তার ঝিক্ঝিক্ শব্দ, আর পুকুরের জলের ওপর আলো-অন্ধকারের চিক্চিকুনি। কেমন যেন বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। সকাল-বেলা ওইখানেই জেলেরা মাছ ধরেছে, ওইখানেই হাঁড়িগুলো রেখেছিল। ওইখানেই অনেক লোকের ভিড় হয়েছিল। কিন্তু ওই জায়গাই যেন আবার তখন অন্য রকম হয়ে গিয়েছে। ও জায়গার রূপ বদলে গিয়েছে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম সেইভাবে। ভালো করে দেখতে চেষ্টা করলাম জলের দিকে। কই, কোথাও তো আমাদের হাঁসের চিহ্ন নেই। কোথাও কিছু নড়ছে না। শুধু ঝিকমিক করছে জল আর আলো-অন্ধকার।

হঠাৎ মনে হলো, কে যেন পেছন থেকে ডাকলে,—খোকন—ও খোকন—

কাছে এসেই বাবা দেখতে পেয়েছে। বললে,—এখানে দাঁড়িয়ে কী করছিস?

বললাম,—হাঁস খুঁজতে এসেছি বাবা—আমাদের খয়েরী হাঁসটা আসেনি—

—তা এমনি দাঁড়িয়ে থাকলে হাঁস খুঁজে পাবি? ডাক্—ডাকতে হবে তো—

বলে বাবা ডাকতে লাগল,—আয় আয়, চই চই, আয় আয়, চই চই—

আমিও ডাকতে লাগলাম তখন,—আয় আয়, চই চই, আয় আয়, চই চই—

হাঁস পাওয়া যাক আর না যাক, আমি এক অদ্ভুত আবিষ্কারের আনন্দে অবাক হয়ে গিয়েছি তখন। আমাদের দু'জনের সেই চই-চই ডাক এপার থেকে ওপারে গিয়ে আছড়ে পড়ে এক অদ্ভুত প্রতিধ্বনির সৃষ্টি হলো। মনে হলো, আমাদের দু'জনের গলার শব্দ যেন পুকুর পেরিয়ে, গোবিন্দ সরকার রোড পেরিয়ে আর একটা পুকুরের ওপারে শেতলাতলার ইটের দেয়ালে গিয়ে ঠেকছে। আমরা ডাকছি, চই-চই, ঠিক সঙ্গে সঙ্গে যেন আরও দু'জন ডেকে উঠছে, চই-চই—চই-চই—

সেদিন রাত্রে ঘুমোতে ঘুমোতেও যেন সেই ঘোর আর কাটলো না আমার। মনে হলো যেন এই ঘাটের ওপর থেকে যদি আমি কাউকে ডাকি তো অনেক দূর থেকে সবাই সে-ডাকে সাড়া দেবে। আমার গলার শব্দ বুঝি অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। যদি বিছানায় শুয়ে শুয়ে সুরেশ্বরীদিদিকে ডাকি তো সুরেশ্বরীদিদিও বোধহয় শুনতে পাবে। ভোলাকে ডাকলে ভোলাও শুনতে পাবে। দূরে কাছে যে-যেখানে আছে, সবাই যেন ডাকলে সাড়া দেবে। আমি যেন আর একলা নই—সবাই আমার কাছে রয়েছে।

কিন্তু যখন আবার সকাল হয়, তখন বাস্তব জগতটার সংস্পর্শে এসে সব ভুলে যাই। রাত্রের স্বপ্ন দিনের বেলা মিথ্যে হয়ে যায়।

আবার মনে হয় আমি যেন একলা। আবার কালীঘাট বাদামতলা, কলাবাগান, খয়রাপটি, শেতলাতলার আকাশ মাটি মানুষ সবাইকে সব-জিনিষকে পর-পর মনে হয়। আবার সুরেশ্বরীদিদির কাছ থেকে অনেক দূরে গিয়ে সান্ত্বনা খুঁজি। যে আদর করে তার কাছে দুর্লভ হবার জন্যে নিজেকে আড়াল করে রাখি!

তোমরা হয়ত বুঝতে পারবে! এ এক অদ্ভুত মনোবৃত্তি! কিন্তু তবু এর জন্যে কাউকে দোষ দেওয়াও তো যায় না।

এমনি করে করে একদিন গরমের ছুটি এসে পড়ে। ছুটি! ছুটি! আর ইস্কুলে যেতে হবে না। আর বাড়িতে মাস্টার আসবে না। আর পড়তে হবে না। মা তখন জিনিষ-পত্র গুছোতে শুরু করে। দিদিমার চিঠি আসে গোয়ালটুলি থেকে। মামারবাড়ি যেতে হবে। বাবা আপিস থেকে দু'দিনের ছুটি নিয়ে আসে। আমার মামারবাড়ি গোয়ালটুলিতে। সেই বাঘা মামা, সেই মিনি —হাজরা ডাক্তারবাবুর মেয়ে মিনি।

এক দৌড়ে সুরেশ্বরীদিদির বাড়ি গিয়ে দাঁড়াই।

বললাম—সুরেশ্বরীদিদি, আজকে মামারবাড়ি যাচ্ছি!

—মামারবাড়ি যাচ্ছিস? কবে আসবি?

—সেই একমাস পরে আবার আসবো! ইস্কুল খোলবার পর!

সুরেশ্বরীদিদি যেন কেমন থমকে দাঁড়ায়।

বলে—আমার কথা ভুলে যাবি না তো?

আশ্চর্য মানুষের মন! আর আশ্চর্য মানুষের মনের ভুলে যাবারও ক্ষমতা! এত যে আদর করবার মানুষ সুরেশ্বরীদিদি, যাকে নিয়ে এত মান-অভিমান-আদর, সেই সুরেশ্বরীদিদিকেও যে মামারবাড়ি গিয়ে কেমন করে ভুলে থাকতে পারতাম, সেইটেই আশ্চর্য! যে-মুহূর্তে ঘোড়ারগাড়িতে উঠে বসতাম সেই মুহূর্ত থেকেই বাদামতলার সব কিছু ভুলে যেতাম। ঘোড়ারগাড়ি চড়ার সে যে কী উত্তেজনা!

বাদামতলা থেকে মামার বাড়ি যেতে কালীঘাটের পুল পেরোতে হতো। ঘোড়ারগাড়ির ভেতরে খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে সেদিনকার দেখা বাইরের পৃথিবীর সেই চেহারা হয়তো আজও সেই রকমই আছে। সেই রাস্তাটা দিয়ে চলতে চলতে যখন

গাড়িটা গিয়ে উঠতো পুলের ওপর—তখন যেন কেমন ভয়-ভয় করতো। অনেক নিচে গঙ্গার ঘোলাটে জল, পাশের রেলিংঘেরা সরু রাস্তাটা দিয়ে লোকজন যাতায়াত করতো।

লালপাগড়ি পরা একটা পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকতো পুলের ওপর। পুলিশ দেখলে আমার বড় ভয় হতো। আমি দেখতাম—ওপাশ থেকে হলদে চেহারার একটা ট্রাম সোঁ সোঁ করে ছুটে আসছে। যদি ধাক্কা লাগে আমাদের গাড়ির সঙ্গে! যদি উল্টে যায় গাড়িটা!

মা সামনের বেঞ্চিতে বসে গলায় আঁচল দিয়ে জোড় হাতে প্রণাম করতো। প্রণাম করতো কাকে? গঙ্গাকে না কালীঘাটের মা-কালীকে, কে জানে! মা'র দেখাদেখি বাবাও দুটো হাত জড়ো করে নমস্কার করতো। আর দু'জনের দেখাদেখি আমিও দু'হাত কপালে ঠেকাতাম।

মা বলতো—রোজ সকালে চৌবাচ্চার বাসি জলটা ছেড়ে দিতে বোলো পাঁচীর মা'কে—বুঝলে?

বাবা বলতো—হ্যাঁগা, ভাঁড়ার ঘরে তালাটা দিয়ে চাবিটা কোথায় রাখলে? আমাকে তো দাওনি?

মা ব্যস্ত হয়ে উঠতো।

—ওমা, তোমাকেই তো দিলাম, কই, আমার আঁচলে তো আলমারির চাবি নেই—বলে নিজের আঁচলের চাবির গোছাটা নিয়ে বার বার দেখতে লাগল। তবে কোথাও পড়ে রইল নাকি! খোকাটা যে হুড়োহুড়ি করে! মামারবাড়ি যাওয়ার আগে সকাল থেকে মার কাজের আর শেষ নেই। যাবার আগে মা'র অনেক কাজ। রান্নাঘরের বাসন-কোশন তুলে ভাঁড়ার ঘরে রেখে তালা চাবি দেওয়া। বাবা বাড়ি থেকেই আপিস করবে—সুতরাং চাল ডাল তেল নুনের যোগাড় করে রাখতে হয়। পাঁচীর মা'কে পইপই করে বুঝিয়ে দিতে হয়।

—সকাল বেলা বাসি কাপড়ে যেন উনুন ছুঁয়ো না বাছা, বাবুর জন্যে ভাত চড়িয়ে বাসনটা মেজে নেবে, তারপর বাজার এলে তখন বাটনা বাটতে বসবে!

শুধু কি তাই!

পাঁচীর মা বলে—কিছু ভেবো না মা, ক'টা দিন আমি ঠিক চালিয়ে দেবো—

মা বলতো—হ্যাঁ, তোমার ওপর ভরসা করে রেখে গেলাম পাঁচীর মা, দেখো যেন অপ্চ নষ্ট না হয়—বাবু বেশি ঝাল খায় না, জানো তো—

ঘোড়ারগাড়ি আসবে বিকেল তিনটের সময়, কিন্তু তাড়া পড়ে যায় সকাল-বেলা থেকেই। যেন দিন আর কাটতে চায় না। সকাল থেকে আকাশের দিকে চেয়ে দেখি, কখন সূর্যটা হেলে পড়ে গাঙ্গুলীদের বাঁশগাছের মাথায় গিয়ে ঠেকবে, তখন বাজবে তিনটে।

মা'কে ঘন ঘন গিয়ে বিরক্ত করি—মা, কখন তিনটে বাজবে ?

মা বলে—সন্ধ্যেবেলা হাঁসগুলোকে ঘরে পুরে দরজা বন্ধ করে দিও—ভুলো না যেন, নইলে শেয়ালে সব শেষ করে দেবে—

এক সময় একটা ঘোড়ারগাড়ির চাকার আওয়াজ পেতাম। বাদামতলার গলির ভেতরে আসছে মাথায় ফুলের ঝুঁটি বাঁধা একটা ঘোড়া আর বাদামী রঙের একটা গাড়ি। ছাদের সামনে খাঁকি কোট পরা কোচোয়ান বসে আছে। আর কারো বাড়িতে নয়, আজ আমাদের বাড়িতেই গাড়ি এসেছে। আর সকলের মতো আমাদেরও মামারবাড়ি আছে। দৌড়তে দৌড়তে সদরদরজা খুলে একেবারে গাড়িতে ওঠবার চেষ্টা করতে গিয়েছি। বাবা ধরে ফেলেছে—যাও, মা'র হলো কি না দেখে এসো তো খোকন, বলো, দেরি হয়ে যাচ্ছে—

মা ততক্ষণ খিড়কির ছোট দরজাটা খুলে দেউড়ি পেরিয়ে জ্যাঠামশাইদের কলতলা পেরিয়ে জ্যাঠাইমা'র কাছে গিয়ে হাজির। জ্যাঠাইমা মা'কে দেখে উঠে বসলো। খালি মেঝের ওপর গরমের দিনে একটা পাখা নিয়ে জ্যাঠাইমা শুয়ে ছিল। মা বললে—দিদি, মাকে দেখতে যাচ্ছি, বাড়ি ঘর সব রইলো, উনি রইলেন একটু দেখো—

জ্যাঠাইমা বললে—তা ঠাকুরপো খাবে কোথায় ?

মা বললে—সে ভাবতে হবে না দিদি তোমাকে, পাঁচীর মা'কে বলে গেলাম, সে-ই আপিসের ভাত করে দেবে—দুটো দিন কেটে যাবে কোনও রকমে—

জ্যাঠাইমা বললে—তা কেটে গেলেই ভালো বাছা,—বলি পাঁচীর মা-ই তোর আপনজন হলো আজ ? আমি না হয় পরের

বাড়ি থেকে এসেছি কিন্তু নিজের মায়ের পেটের ভাই তো আর তা বলে পর নয়, এক মায়েরই তো দুধ খেয়েছে—

দেখতাম কথাগুলো শুনতে শুনতে মা'র চোখ দুটো কেমন ছলছল করে উঠতো, তাড়াতাড়ি জ্যাঠাইমা'র পায়ের ধুলো নিয়ে মা মাথায় ঠেকিয়ে চলে আসতো। আমিও পেছন পেছন আসতাম। শেষে মা দাঁড়াতো তুলসী গাছতলায়। সেখানেও প্রণাম করতো একবার।

বাবা দরজার কাছে এসে জোরে জোরে বলতো—কই, এত দেরি কিসের?

মা আলতা পরেছিল। একটা চওড়া পাড় শান্তিপুরের শাড়ি পরেছিল, পান খেয়েছিল—কপালে একটা সিঁদুরের টিপ দিয়েছিল। কী চমৎকার যে দেখাচ্ছিল মাকে! যেন অনেকদিন মা'র এ চেহারা দেখিনি! মনে আছে যেদিন দুপুরবেলা মা পান মুখে দিয়ে মেঝের ওপর শুতো সেদিন কত ভালো লাগতো মা'কে! যেন ঠিক দুর্গাঠাকুর!

আমি বলতাম—আমার ভাই নেই কেন মা? আমার একটা ভাই এনে দাও—

মা বলতো—তোর বুঝি একলা খারাপ লাগে রে?

বলতাম—তোমার কেমন ভাই আছে, ফটিকদের কেমন ভাই আছে—কার্তিকদের ভাই আছে—

কার্তিকদের বাড়ি গিয়ে দেখতাম—কার্তিকের মা একটা মস্ত বড় বগি থালায় ভাত নিয়েছে আর কার্তিকরা চারদিকে গোল হয়ে বসেছে। এক-এক করে সকলকে এক-এক গাল ভরে খাইয়ে দিচ্ছে কার্তিকের মা।

আমি গিয়ে ওদের উঠোনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম আর মনে মনে কেমন দুঃখ হতো। আমার ভাই নেই, আমার বোন নেই। আমার কেউ কোথাও নেই। আমি একলা।

মামারবাড়ির কাছে ছিল মিনিদের বাড়ি। হাজরা ডাক্তারবাবুর ছোট মেয়ে মিনি! ছোটবেলায় যখন মামারবাড়ি যেতাম, একদিন তাকে বলেছিলাম—এই, তুই আমার ভাই হবি ভাই?

মিনি বলেছিল—ওমা তুই একটা বোকা গাধা—আমি তো খুকি, খুকি না কি ভাই হয়?

বললাম—তবে কী হয়?

মিনি বললে—খুকীরা তো বোন হয়, আর ভাই হয় তো খোকারা!

বললাম—তবে তুই আমার বোন হবি? বেশ আমার মা'র কাছে শুবি? আমরা এক থালায় ভাত খাবো, একসঙ্গে ভোলাদের পুকুরে মাছ ধরবো!

ভোলাদের পুকুরে ভোলা আর আমি মাছ ধরতুম। সে-কথা তো তোমাদের বলেছি। ভোলাদের পুকুর ঠিক নয়। পুকুরটা ছিল ভোলাদের বাড়ির গায়ে। পেল্লাদ চৌধুরীরা মাছের ব্যবসা করতো। মাছের ডিম ছাড়তো পুকুর জমা নিয়ে। সেই মাছ বড় হতো, আর পেল্লাদ চৌধুরীদের দরোয়ান চৌবেজী দিনের মধ্যে একবার করে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিয়ে যেত। আমরা পুকুরে ছিপ ফেলে চেয়ে থাকতাম কার্তিকদের বাড়ির পাশের রাস্তার দিকে। ওইখান দিয়ে চৌবেজী আসতো মাথায় পাগড়ি পরে। চৌবেজীকে দেখেই আমরা লুকিয়ে পড়তাম ভোলাদের বাড়ির ভেতরে। আর কেউ ধরতে পারতো না। সে-সব কথাও তো তোমাদের বলেইছি!

তা মিনি জিজ্ঞেস করতো—তোদের বাদামতলায় ট্রামগাড়ি আছে?

আমি বলতাম—না, কিন্তু তোদের ভবানীপুরে তো আমাদের মতন পুকুর নেই?

মিনি বলতো—হ্যাঁ আছে, আমাদের জলটুঙি আছে—সেখানেও অনেক মাছ আছে—

—তুই সাঁতার জানিস?

মিনি বলতো—আমি তো মেয়েমানুষ, সাঁতার শিখে কী করবো! সাঁতার তো বেটাছেলেরা শেখে!

কালীঘাট পুল পেরিয়ে ঘোড়ারগাড়িটা তখন পাথরের রাস্তা দিয়ে গড়গড় করে গড়িয়ে নামছে। সমস্ত গায়ে বেশ ঝাঁকুনি লাগছে। পুল থেকে নেমেই বাঁ পাশে একটা ঘোড়ার গাড়ির আড্ডা। আমাদের গাড়ির মতন অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

বাবা বললে—খোকনকে যেন ছাদে উঠতে দিও না, বুঝলে—

মামারবাড়ির ছাদ নেড়া। চারিদিকে ঘেরা নেই। বিরাট ছাদ। ছাদের ওপর ফুটবল খেলা যায় এত বড়। ছাদ থেকে

পাশের হাজরা ডাক্তারবাবুর বাড়িটা দেখা যেত। আমি সেই ছাদে গিয়ে দাঁড়ালে চারিদিকে অবাক হয়ে চেয়ে দেখতাম। এত বাড়ি। বাড়ির পর শুধু বাড়ি কেবল। হলদে, লাল, কালো, শ্যাওলা ধরা। পশ্চিম দিকে গঙ্গা। গঙ্গাটা বেঁকে বেঁকে উত্তর দিকে কোথায় জিরেটের পুলের তলা দিয়ে আরো পশ্চিমে চলে গিয়েছে। চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে দেখতে কেমন যেন সব ভুলে যেতাম। আরো ওদিকটাতে চিড়িয়াখানা। সন্ধ্যেবেলা চিড়িয়াখানার দিক থেকে বাদুড়গুলো এক-এক করে উড়ে যেত বাদামতলার দিকে। বাদামতলার পেছনে টালিগঞ্জ বেহালা কুদঘাটা আরো কত সব নাম-না-জানা জায়গা। সেইখানে লিচু আর আঁশফল গাছের জঙ্গল। বাদুড়গুলো কেবল সেইদিকে উড়ে যেত, আর বাদামতলাতে যেমন, মামারবাড়িতে গোয়ালটুলিতে এসেও তেমনি, সেই দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতুম। রাত্তির বেলা মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরে চিড়িয়াখানার বাঘের ডাকে চমকে উঠতুম। মনে হতো যদি একটা বাঘ এখনি খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে পড়ে আর দৌড়ে চলে আসে গোয়ালটুলি লেনে-এ!

বাবা বললে—সেদিন একটা ছেলে ছাদে ঘুড়ি ধরতে উঠে ছাদ থেকে পড়ে গিয়েছিল—একটু দেখবে ওকে, বুঝলে—

সত্যি, অসংখ্য ঘুড়ি উড়তো তখন গোয়ালটুলিতে। রাস্তায় গলিতে গলিতে দেখা যেত একজন বোম্বাই লাটাই নিয়ে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে আর দশ বারোটা ছেলে তাকে ঘিরে অবাক হয়ে দেখছে। ঘুড়ির সঙ্গে যেন তারাও আকাশে ঘুরে ঘুরে উড়ছে। সে যে কী উত্তেজনা! এক-একটা ঘুড়ি কেটে যেতেই চল্লিশ পঞ্চাশজন ছেলে দৌড়ল কুড়োতে। এর পাঁচিল ডিঙিয়ে, ওর মাঠ পেরিয়ে। শেষকালে অচেনা কাদের বাড়ির মধ্যে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে একেবারে ছাদে উঠে গিয়েছে। তারপর ঘুড়ি নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি কাড়াকাড়ি। এ-বলে আমার ঘুড়ি, ও বলে তার। শেষে যে-ঘুড়ি নিয়ে অত কাণ্ড, সেই ঘুড়িই কখন টানাটানিতে ছিঁড়ে গিয়েছে, বাড়ির লোকজন দৌড়ে এসেছে।

—কে রে তোরা? কোন্ পাড়ার ছেলে সব?

শেষে অনেক কষ্টে ছেলের দলকে বাড়ি থেকে বার করে দরজা বন্ধ করে দিলে তবে শান্তি। সমস্ত গ্রীষ্মকালটা এমনি। তারপর

যেদিন বিশ্বকর্মা পুজো হতো, সেইদিন ঘুড়ি উড়িয়ে ছেলেরা লাটাই তুলে রেখে মার্বেলগুলি নিয়ে খেলতে বসতো রাস্তার গলিতে।

মিনি একটা ঘুড়ি দিয়েছিল আমাকে। বলেছিল—তোর জন্য রেখে দিয়েছিলুম, আমাদের ছাতে পড়েছিল—

কিন্তু ওড়াবো কী করে ? লাটাই কোথায় ?

বাবা বললে—না না, ওসব বদ ছেলেদের মতন ঘুড়ি-টুড়ি ওড়াতে হবে না—তাহলে ওই ওদের মতন কেবল রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে সারাজীবন—

মা-ও পয়সা দিতো না। দুপুর বেলা যখন মা খাওয়া-দাওয়া সেরে মেঝেতে শুয়ে ঘুমোতো তখন আঁচল থেকে পয়সা খুলে নেবার লোভ হতো। চার আনা দাম একটা লাটাই-এর। সেই চার আনা পয়সার জন্যে যে কত কেঁদেছি, কত বায়না করেছি। চার আনা পয়সা এলে যেন জীবনে আর কিছু চাইবার থাকবে না। একটা লাটাই পেলে আর কী-ই বা চাই জীবনে! একটা লাটাই পেলে মিনির দেওয়া ঘুড়িটা নিয়ে নিজেই যেন আকাশে উড়তে পারি। গাড়িটা তখন পটোপাড়া দিয়ে চলেছে গড়গড় করে। দু'পাশে টিনের চালাওয়ালা দোকান। তেলেভাজা, মুদিখানা, স্যাকরার দোকান—রাস্তায় দু'পাশে রকের ওপর বসে আড্ডা দিচ্ছে ছেলেরা। আর আমাদের ঘোড়ারগাড়ির জানলা-দরজা সব বন্ধ। কিন্তু আমি জানলার ফুটো দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখছি—আর কতদূর! আর কতদূরে আমার মামারবাড়ি। মামারবাড়ি যেন আর আসে না। মামারবাড়ির কাছাকাছি এলেই আমি চিনতে পারবো। একটা ছোট জলের কল, আর চার পাঁচজন লোক সেখানে বালতি ঘড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার পরেই গোয়ালটুলি। গোয়ালটুলির বাড়িগুলোর দেয়ালে ঘুঁটে দেওয়া থাকে। সেই ঘুঁটে দেওয়া থাকলেই চিনতে পারি আমি। তারপরেই হাজরা ডাক্তারবাবুর ডাক্তারখানা। ভেতরে দেখা যায় মিনির বাবা বুকে কল ঝুলিয়ে রুগী দেখছে। রুগীর ভিড়ও খুব। পাশে একটা ওষুধের আলমারি। কত রকম বেঁটে লম্বা গোল নানান মাপের নানান রঙের শিশি ভেতরে! আর হাত ধোয়ার একটা টেবিল। টেবিলটার মধ্যেখানে গর্ত করে একটা কাঁচের টব বসানো। তার এক কোণে একটা লাল রং-এর সাবান

—আর একটা হাত মোছবার ঝাড়ন। কিন্তু যেটা দেখে সব চেয়ে ভয় পেতাম সেটা ছিল বাঁ পাশের আলমারিতে। বাইরের কাচ দিয়ে দেখা যেত ভেতরে থরে থরে সাজানো রয়েছে চক্চকে ছুরি। বড় থেকে ছোট নানান মাপের।

দিদিমা তরকারি কুটছিল একটা বঁটি নিয়ে। আমাদের দেখেই উঠে দাঁড়ালো। বললে—ওমা, খুকি এলি—

মা'র নাম খুকি! কেমন যেন লাগতো ভাবতে।

বাবা গাড়িভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকে বললে—এই পুঁটলিটা রইল—আমি চললুম—

দিদিমা বলতো—তা খেয়ে-দেয়ে গেলে হতো না—

মা বলতো—না মা, ওঁর কাজ রয়েছে—

বাবা চলে যেত। দিদিমা আমার চিবুকে হাত দিয়ে একটা চুমু খেয়ে বলতো—সকাল থেকেই মনটা কেমন করছিল রে, ভাবছিলুম সোনাকে ক'দিন দেখিনি—হ্যাঁরে, এমন রোগা হয়ে গেল কেন ছেলেটা—যত্ন আত্তি করিস না বুঝি!

মিনি এসে বলতো—ওমা, তুই কত বড় হয়ে গিয়েছিস রে?

আমার মনে হতো মিনিও যেন কত বড় হয়ে গিয়েছে। আগের বারে দেখে গিয়েছি কত ছোট চুল। এবার সেই চুল ঘাড় পর্যন্ত নেমেছে, দু'দিকে বেণী করে বেড়া-বিনুনি বেঁধেছে।

বললাম—আমার লাট্টু দেখবি?

বলে পকেট থেকে লাট্টুটা বের করে দেখালাম। মাথাটা লাল। মিনির চোখের দিকে চেয়ে দেখলাম লাট্টু দেখে তার লোভ লাগছে কিনা।

মিনি বললে—ঘোরাতে পারিস?

বললুম—লেত্তি নেই, লেত্তি থাকলে দেখতিস বন্‌বন্ করে ঘুরিয়ে দিতুম! ভোলা আমাকে দিয়েছে।

মিনি বললে—আমার সেই ঘুড়িটা তোকে দিয়েছিলুম, সেটা কী করলি?

বললাম—সে ছিঁড়ে গিয়েছে—বাবা যে ঘুড়ি ওড়াতে দেয় না—

মিনি বললে—আমার একটা পুতুল আছে, দেখবি?

বললাম—কী পুতুল ?

—আলুর পুতুল, আয় দেখবি আয়—বলে, আমায় টানতে টানতে নিয়ে যেত নিজেদের বাড়ি !

দিদিমা বলতো—ওমা তোর ছেলে কোথায় গেল রে খুকি ? আসতে না আসতেই ওদের বাড়ি গিয়েছে, কিছু খেলে না দেলে না, হট্ করে চলে গেল !

দিদিমার মাথার সব চুল পেকে গিয়েছিল। রান্নাঘর থেকে ডাকতো—ও খুকি, তোর ছেলেকে ডাক, কিছু খেতে হবে তো, হাত মুখ ধোবে না ?

বিরাট বাড়ি দিদিমার। বাদামতলার বটুক মিত্তিরেরও সাবেকী বাড়ি বটে। কিন্তু তা ভাগ হয়ে হয়ে পরিসর ছোট হয়ে এসেছিল। পাঁচিল দিয়ে দিয়ে একখানাকে দশখানা করা হয়েছিল, তাই নড়তে চড়তে রাস্তা আর পুকুরপাড় ছাড়া জায়গা ছিল না। সুরেশ্বরীদিদির বাড়ির পাশে আমড়া গাছটার ওপর তাই আমার অত লোভ ছিল। তাই বাদামতলা পেরিয়ে কালীঘাট ইস্টিশানের দিকে মন উড়ে বেড়াতো। কিন্তু দিদিমার বাড়িতে অজস্র জায়গা। দু'মহল উঠোন। বার-বাড়ি থেকে ভেতর-বাড়িতে ঢুকে রান্নাঘর কল চৌবাচ্চা সব। কিন্তু লোকজন কেউ নেই তাই কেমন ময়লা-ময়লা। ঘরের পর ঘর তালা চাবি বন্ধ। ভেতর থেকে একটা ভ্যাপসা গন্ধ আসতো নাকে। হঠাৎ কোনও কাজে একটা ঘরের তালাচাবি খুললে ভেতর থেকে ফরফর করে চামচিকে বেরিয়ে আসতো।

দিদিমা বলতো—কার ঘর কার বাড়ি, আর কার জন্যেই বা এ-সব আগলাচ্ছি কে জানে—

মামারবাড়ির এত বড় সম্পত্তি যিনি এককালে করেছিলেন তিনি বেঁচে থাকলে তাঁর চোখ দিয়েও বোধহয় ঝরঝর করে জল পড়তো। কবে একদিন এই বাড়ির পূর্বপুরুষ বহুদূর থেকে এখানে এই গঙ্গার ধারে এসে ব্যবসা শুরু করেছিলেন। ধান চালের ব্যবসা। ঢাকা ফরিদপুর বরিশাল চাঁটগা থেকে আসতো বস্তা বস্তা ধান চাল নৌকো বোঝাই হয়ে। আর এখানে বসে হাঁটুর কাপড় তুলে মাদুরের ওপর তাঁর খেরো খাতায় হিসেব লেখা হতো। চালের দর ওঠে না, ধানের দর ওঠে না। পয়সা যা হয় তাতে কোনও

রকমে বউ-বেটা নিয়ে কায়ক্লেশে চলে যায়। একটা চালাঘরও তিনি বানিয়েছিলেন এইখানে। তখন কলকাতা শহর এত বড় হয়নি। ভবানীপুর ছিল তখন নামে গোবিন্দপুর। গঙ্গার ওপারে শেয়াল ডাকতো। বুনো শুয়োরের ভয়ে সন্ধ্যের পর কাজ-কারবার গুটিয়ে চালার ভেতরে এসে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিতে হতো। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহেবরা এল—মুর্শিদাবাদের নবাব পলাশীর লড়াইতে হেরে গেল। সে-সব তাঁর দেখ্‌তো। ভয়ে ভয়ে এসে এইখানে এই গোবিন্দপুরের জঙ্গলের ধারে একপাশে গঙ্গার ঘাটের ওপর কারবার ফেঁদেছিলেন টুকিটাকি। ভেবেছিলেন যা হোক দুটো পয়সা যদি আসে তো তাই দেশে পাঠিয়ে ছেলে-বউ-এর ভরণপোষণটা চলবে। কিন্তু হঠাৎ ভাগ্য ফিরে গেল এক অদ্ভুত উপায়ে। ভাগ্য ফিরলো ঠিক ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়ে।

বলতাম—মন্বন্তর কী দিদিমা ?

—মড়ক রে, দেশে মড়ক এল, আমার শাশুড়ীর কাছে শুনেছি সে বড় বিষম মড়ক, লোকে খেতে পায় না, পরতে পায় না, গোলায় ধান নেই, খামারে গরু ছাগল নেই—লোকে পেটের দায়ে গরু বেচতে লাগল—

অন্ধকার গোয়ালটুলি লেনের বাড়ি। গল্প শুনতে শুনতে কেমন ছম্‌ছম্‌ করতো গা-টা। মামারবাড়ির প্রত্যেকটা ইট যেন সেই অন্ধকারে সজীব হয়ে হাঁটা চলা করতে শুরু করতো। তারপর অন্ধকার মাঝরাত্রে আবার সেই চিড়িয়াখানার বাঘের ডাক। একটা হরতকী গাছ ছিল বাড়ির পেছনে। গাছ থেকে টপ টপ করে পাকা হরতকী ফল পড়তো ছাদের ওপর—আর আমাদের শোবার ঘরের ওপর খট খট করে শব্দ হতো। মনে হতো কে যেন খড়ম পায়ে দিয়ে ছাদের ওপর আস্তে আস্তে হাঁটছে।

বলতাম—তারপর ?

দিদিমা বলতো—ওমা তুই বুঝি এখনো ঘুমোসনি !

মা বলতো—ছেলের চোখে কি ঘুম আসতে নেই—এত কিসের গল্প করছো ওর সঙ্গে মা—

দিদিমা বলতো—এই বলছি তোদের বাড়ির কথা—তোরা এলি খুকি তবু দুটো কথা শুনতে পেলাম, যেন ভূতের বাড়ি হয়েছে এক। একা একা দিন আর কাটতে চায় না—

মা বলতো—দাদার একটা বিয়ে দাও না মা এবার !

দিদিমা বলতো—বাঘার বিয়ে দেবো, তা হলেই হয়েছে—এখন তবু বেঁচে আছি, বাঘার বিয়ে দিলে আমায় আর জ্যান্ত দেখতে পাবি না তুই—

—য়্যাই, এত ঝামেলা কেন রে বাড়ির ভেতর, সেই বখাটে ছোঁড়াটা এসেছে বুঝি ?

তু'দিন তিনদিন বাঘা মামার দেখা নেই, হঠাৎ হয়ত একদিন তুপুর বারোটার সময় বাড়ি এসে হাজির। উস্কোখুস্কো চুল। খালি পা। গায়ের সার্টের সবগুলো বোতাম খোলা—ভেতরে বুকের লোমগুলো দেখা যাচ্ছে। এসেই একেবারে তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে বসবে।

—তেল দাও মা, চান করবো !

দিদিমা তাড়াতাড়ি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললে—ওমা বাঘা এসেছিস্—হ্যাঁরে, তা এদ্দিন কোথায় ছিলি—আমি ভেবে ভেবে মরি—

মামা বলে—মাইরি আর কি। তোমায় আর ন্যাকামি করতে হবে না—বেশ জলজ্যান্ত বেঁচে আছ আর বলে কিনা ভেবে ভেবে মরে যাচ্ছে ! বেশ তো দেখছি দিব্যি চান-টান করে গায়ে হাওয়া লাগাচ্ছো—কী রাঁধলে আজকে ?

দিদিমা বলে—আমার আবার রান্না আমার আবার খাওয়া —তুই এলি, এবার রাঁধবো তোর জন্যে—তা মাছ কিন্তু নেই—। তিনদিন কোথায় ছিলি ?

মামা বললে—বলে কোথায় ছিলি ! তোমার কথা শুনলে গা জ্বলে যায়—আমি বলে টাকার ধান্ধায় হয়রান হচ্ছি ঘুরে ঘুরে আর বলে কিনা কোথায় ছিলি !

দিদিমা বলে—মায়ের প্রাণ যে কী তা তুই বুঝবি কী করে বল—! বিয়ে তো করলি না—সংসারও বুঝলি না—

মামা হয়তো খেতে বসেছে। আর সামনে বসে দিদিমা খাওয়ার তদারক করছে একটা পাখা নিয়ে।

মামা খেতে বসে হঠাৎ একেবারে তেরিয়া মেরিয়া করে উঠেছে —এ কী রেঁধেছ, ভাত খাচ্ছি না ছাই খাচ্ছি, উনুনের ছাই খাচ্ছি—

দিদিমা বলতো—তা আমি বুড়ো মানুষ যা পেরেছি তাই করেছি

কী করবো বল! তোর বউ এসে তখন ভালো করে রেঁধে দেবে—

মামা বলতো—তা বউ কি আমি আনতে পারি না ভেবেছ? তো আমি এখুনি আনতে পারি, কিন্তু যা ছিরির বাড়ি তোমার, এখানে মানুষ থাকতে পারে?

দিদিমা বলতো—তা তোরই তো বাড়ি! আমি মরে গেলে তুই-ই তো থাকবি এ-বাড়িতে—পারিস তো বাড়িটা সারা তুই—

মামা তখন ভাত গিলছে। ভাতের দলাটা কোঁৎ করে গিলে বললে—হ্যাঁ, আমি সারাই, খুব আরাম তো তোমার! আমি শালা পয়সা খরচ করে সারাবো আর তোমরা মা বেটি আর জামাই মিলে ভোগ-দখল করো আর কি! সুখ রাখবার আর জায়গা পাওনি?

দিদিমা বলতো—ওমা, ও কী কথা! খুকি তোর বাড়িতে আসতে যাবে কেন, আমার জামাই-এর নিজের বাড়ি নেই!

—তবে ও-ছোঁড়াটা এখানে এত ঘন ঘন আসে কেন শুনি?

—কোন্ ছোঁড়াটা? কা'র কথা বলছিস? দিদিমা ঠিক বুঝতে পারে না।

—ওই যে তোমার বখাটে নাতি। ও-বেটা সহজ চিজ নয় বাবা, আমি দাঁত দেখলেই চিনতে পারি। এই বয়েসেই ফোক্কড় হয়ে উঠেছে, বিড়ি খায়!

দিদিমা চমকে উঠতো। বলতো—ওমা বলিস কী তুই—আমার ওইটুকু নাতি বিড়ি খেতে যাবে কেন?

মামা বিজ্ঞের মতন হেসে উঠতো। বলতো—খায় খায়—তোমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে কি খাবে, লুকিয়ে লুকিয়ে আড়ালে পাইখানায় বসে বসে খায়, এই তো খাবার বয়েস—

দিদিমার অবস্থা দেখে মাঝে মাঝে সেই বয়েসেই আমার খুব কষ্ট হতো, দেখতাম দিদিমা ভোরবেলা গঙ্গারঘাটে স্নান করতে যেত। এক-একদিন আমি ঘুম ভেঙে উঠলে আমাকেও নিয়ে যেত সঙ্গে করে। গোয়ালটুলি লেনের গলিটা আমাদের বাড়ির পশ্চিমে। সেই রাস্তাটা ঘুরে উত্তরদিকে গিয়েছে। উত্তরদিকে খানিকটা গিয়েই বাঁয়ে বেঁকেছে। গঙ্গারঘাটে গেলে সেই দিকে যেতে হয়। ঠিক সেই জায়গাটায় গোয়ালটুলির একটা শনি-ঠাকুরের মন্দির ছিল। লোকে বলতো শনিতলা। কতদিন ভোরবেলা দিদিমার সঙ্গে

গঙ্গারঘাট থেকে ফেরবার পথে দেখেছি দিদিমা মন্দিরে ঢুকে ভিজে আঁচলটা গলায় জড়িয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করেছে। আর সে কি একটুখানি প্রণাম! দিদিমার প্রণাম যেন আর শেষ হতো না। এক-একদিন প্রণাম করতে করতে কী যেন বলতো দিদিমা, কিছু বোঝা যেত না। এক-একদিন দেখতাম দিদিমার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ছে। তারপর পাশ ফিরে হঠাৎ ঠাকুরের, ফুলটা আমার মাথায় ছুঁইয়ে বলতো, চলো সোনা, এবার চলো—

গোয়ালটুলি লেনটা মাড়াতে মাড়াতে আবার বাড়ি ফিরে আসতাম দু'জনে। একজনের বয়েস সত্তর-আশী কি নব্বই কত কে জানে, আর একজন নতুন দেখতে-শেখা শিশু। সেই পুরনো ভবানীপুরের সেই ইতিহাস মাড়িয়ে মাড়িয়ে আজ অবশ্য অনেক দূরে এসে পৌঁছেছি—অনেক আলো অনেক অন্ধকারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কখনও হেসেছি কখনও কেঁদেছি, কিন্তু আমার অনেক হাসি কান্নার সঙ্গী সেই সব মানুষদের আজো ভুলিনি, ভুলতে পারিনি।

আমি দিদিমাকে জিজ্ঞেস করতাম—ঠাকুরের কাছে তুমি কী বলছিলে দিদিমা ?

দিদিমা অবাক হয়ে যেত। বলতো—ওমা তুই শুনেছিস বুঝি ?

—শুনেছি, কিন্তু বুঝতে পারিনি। তুমি দেখলাম বিড়বিড় করে কী বলছিলে ?

দিদিমা বলতো—বলছিলাম তোর মামার কথা আর তোর কথা !

সত্যিই মামার জন্যে দিদিমার কী কষ্টই যে হতো! উঠোনে দাঁড়িয়ে মামাকে দেখে দিদিমা সামনে গিয়ে দাঁড়াতো। বলতো—শোন তো বাঘা—

বাঘা রেগে উঠতো—ঘুম থেকে উঠতে না উঠতে ফ্যাচফ্যাচ আরম্ভ করলে তুমি ?

দিদিমা প্রসাদী জবা ফুলটা নিয়ে মাথায় ঠেকাতে চেষ্টা করতেই বাঘা মামা এক হ্যাঁচকা টানে ফুলটা কেড়ে নিয়ে একেবারে পা দিয়ে মাড়িয়ে পিষে ফেলেছে।

আঁৎকে উঠেছে দিদিমা।

—ওরে, পেসাদী ফুল যে, করলি কী তুই ? পাপ হবে যে

—হুত্তুরি তোমার পাপের নিকুচি করেছে, পাপ-ফাপ সব পা দিয়ে মাড়িয়ে দিলুম, এই দেখো। বলে পেসাদী ফুলটা নিয়ে পা দিয়ে একটা সুট মারলে বাঘা-মামা।

তারপর হঠাৎ আমার কানটা ধরে ধমকাতে শুরু করলে—এই ছোঁড়া, তুই বড় হাসছিস যে! মামারবাড়িতে খুব সুখ বুঝি, পরের ঘাড়ে চড়ে ফোকটে বেশ খাওয়া হচ্ছে—

আমার কান্না শুনেই দৌড়ে আসতো মা।

বলতো—দাদা, তুমি কী বলো তো? তোমার ঘাড়ে চড়ে আমরা খাচ্ছি, তুমি এই কথা বলতে পারলে! ক'টা পয়সা তোমার খরচ করেছি শুনি? আমাদের জন্যে ক'টা পয়সা তোমার খরচ হয়েছে বলো তো?

মামা প্রথমটা মায়ের কান্না শুনে অবাক হয়ে যেত। বলতো —ওরে বাবা, এ আমারই খাবে আবার আমার ওপর চোখ রাঙাবে।

দিদিমা আর থাকতে পারতো না। বলতো—তুই কোথায় যাচ্ছিলি যা না বাঘা, তুই বাড়িতে থাকিস নে, সেই ভালো—তোর বাড়িতে ঢুকে কাজ নেই, তুই বেরো, বেরো তুই—

মামা কথাটা শুনে তেরিয়া হয়ে উঠতো। বলতো—মাইরি আর কি। বেরোবো, বেরিয়ে যাবো, তাহলে আমার টাকা আমায় দিয়ে দাও, আমি টাকা নিয়ে এখনি বেরিয়ে যাচ্ছি—

—টাকা? কিসের টাকা? তোর আবার কীসের টাকা শুনি?

দিদিমা একহাতে মা'কে আর একহাতে আমাকে আগলে নিয়ে মামার মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াতো!

মামা বলতো—বাঃ বেশ! টাকার কথা বলেছি কিনা, অমনি কীসের টাকা! আমার বাবার টাকা! বাবা আমাকে যে-টাকা দিয়ে গিয়েছিল সেই টাকা দাও—বারো হাজার টাকা!

দিদিমা চিৎকার করে উঠতো—বারো হাজার টাকা! বারোটা আধলা পাবিনে আমাকে খুন করলে, বারো হাজার টাকা চাইতে এসেছিস আমার কাছে! তোকে মানুষ করেছি কোন টাকা দিয়ে শুনি, এত বড়টা যে হলি সে কোন টাকায়! আমি রোজগার করেছি, না তুই রোজগার করে এনে আমার হাতে দিয়েছিস?

মামা তখন রাগে অন্ধ হয়ে গিয়েছে। বললে—তাহলে আমার বাড়ি আমায় ফিরিয়ে দাও—

দিদিমা বলতো—কোন্ বাড়ি ?

—কেন, যে-বাড়িতে রয়েছ তুমি ? এ-বাড়ি কার ? এ আমার বাড়ি ! আমি এ-বাড়ি ভেঙে ফেলবো, বেচে দেবো, দান করে দেবো, আমার যা খুশি করবো—

দিদিমা আমাদের নিয়ে ঘরের ভেতর চলে যেত। আর মামা তখন চিৎকার করতো—আমি দেখে নেবো কেমন করে এ-বাড়িতে থাকো তোমরা, মেয়ে-জামাই আমার এ-বাড়ি কেমন করে ভোগ-দখল করে দেখিয়ে দেবো, দেখিয়ে দেবো আমি, আমার নাম বাঘা সিংহী, মনে থাকে যেন, হ্যাঁ—

বলতে বলতে মামা হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেত।

দিদিমা তখন চোখের জল ফেলতো আর বলতো—দেখলি তো খুকি, বাসি মুখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল ছেলেটা ! আমার পেটেই এমন ধারা ছেলে জন্মাতে হয় ? আরো তো পাড়ায় দশজনের ছেলেরা রয়েছে, কেমন বৌ নাতি-নাতনি নিয়ে ঘর-সংসার করছে সবাই !

বলে কাঁদতে কাঁদতে দিদিমা সংসারের কাজ করতে বসতো !

সন্ধ্যে বেলা বাবা আপিস থেকে ফিরে আসতো আমাদের দেখতে। হাতে মস্ত বড় পোঁটলা। তাতে আলু, পটল, মাছ, ডিম, আম, কাঁটাল, দিদিমার থান কাপড়, কত কী জিনিস ! আপিস থেকে একেবারে বাজার করে এনেছে। আসতে আসতে ঘেমে গিয়েছে। হাতের পোঁটলাটা নামিয়ে প্রথমেই আমার কথা জিজ্ঞেস করতো—খোকন কোথায় ?

দিদিমা বলতো—আমার কাপড় আবার আনতে গেলে কেন বাবা !

মা বলতো—আমরা না দিলে তোমায় কে দেবে বলো ! কত সুখে যে আছো, তাতো দেখতে পাচ্ছি।

দিদিমা বলতো—তা হোক, আমার জন্যে এত টাকা খরচ ভালো লাগে না।

বাবা আবার জিজ্ঞেস করতো—খোকন কোথায় ? খোকনকে দেখছি না যে—

মা বলতো—হাজরা ডাক্তারবাবুর বাড়িতে খেলছে—

—যখনই আসি, ও-বাড়িতে কেন ?

মা পাশে দাঁড়িয়ে পাখার বাতাস করতো বাবাকে। বলতো, —পাঁচির-মা ভাত দেয় তো সময় মতো ?

বাবা বললে—হ্যাঁ দেয়—

—আসছে মাসে গয়লা তিন টাকা ধার নিয়েছিল, তুমি যেন আবার সব পাওনা মিটিয়ে দিও না, দাম চাইলে বলো, আমি গিয়ে সব হিসেব দেখে শোধ করে দেবো।

বাবা বললে—খোকন ছাদে ওঠে না তো ?

মা বলতো—চৌবাচ্চাটা ঝাঁট দিয়ে ফেলতে বলো, বাসি জল যেন না রাখে।

বাবা বলতো—একটু বই নিয়ে বসতে বলো খোকনকে, পড়াগুলো একেবারে ভুলে যাবে সব—

মা বলতো—রাত্তির বেলা শোবার আগে সদর দরজায় খিল দিয়ে শুয়ো, বাদামতলায় যা চোরের উৎপাত—

বাবা বলতো—খোকন আমার কথা বলে না ?

আমি তখন হয়তো হাজরা ডাক্তারবাবুর বাড়িতে খেলা করছি। মিনির পুতুলের বাক্স নিয়ে সাজিয়ে রাখছি। আমার ছেলের সঙ্গে মিনির মেয়ের বিয়ে হয়। আমরাই বরকর্তা আমরাই কনেকর্তা আবার আমরাই সে বিয়ের নেমন্তন্ন খাই। বাইরের ঘরের দিকটা মিনির বাবার এলাকা। সেখানে যাওয়া নিষেধ। ছুরি কাঁচি আর কেবল ওষুধের একটা কড়া গন্ধ ওদিকে গেলে নাকে আসে। মিনিদের বাড়ির রান্নাঘরের পেছনে একটা চালাঘর। চালাঘরের ভেতরে আমাদের দু'জনের জগৎ।

আমি বলি—ভোলার দিদিটা ভারি পাজী, জানিস—

—কেন রে ?

—ভোলার সঙ্গে আমি খেলি বলে ভোলার দিদি আমাকে কেবল বকে !

—তুই ভোলাদের বাড়ি যাস কেন ? তুই এখানে থাক না। দু'জনে বেশ সারাদিন একসঙ্গে খেলবো।

—আমার মামা যে বকে !

খেলতে খেলতে কখন বেলা গড়িয়ে আসতো। রঘু ডাকতে

আসতো মিনিকে। বিকেলবেলা মিনি দুধ খেতো। এক বাটি দুধ নিয়ে পেছনে পেছনে ছুটতো ওর মা। মিনিও দৌড়ে দৌড়ে এ-ঘর থেকে ও-ঘর করতো!

—দুধটা খেয়ে নে মা!

আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম। ভারি মজা লাগতো তখন।

কাকীমা বলতো—তবে সব দুধ খোকনকে দিয়ে দিই—এই দিলুম, দিই!

মিনি থমকে দাঁড়াতো, দেখতো কাকীমা আমাকে দেয় কি না। কাকীমা আমার কাছে এসে বলতো—ও মেয়েকে কিছু খেতে দেবো না, খাও তো বাবা, ওর দুধটা খেয়ে নাও তো তুমি—

আমি এক দৌড়ে চলে আসতুম মামারবাড়ির ভেতরে।

একদিন সন্ধ্যে বেলা বাড়ি ফিরছি বেড়িয়ে, হঠাৎ কে যেন কানটা জোর করে ধরে ফেললে। সামনে চেয়ে দেখি মামা! বাঘা-মামার চেহারাটা দেখেই ধড় থেকে প্রাণটা যেন বেরিয়ে গেল।

মামা বললে—এই ছোঁড়া, দাঁত দেখা, শিগগির দাঁত দেখা, হাঁ কর—

হাঁ করলাম। তখনও মামা আমার কানটা ধরে আছে।

মামা আমার মুখের কাছে মুখ নিচু করে মুখের ভেতর কী যেন পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টি দিয়ে দেখতে লাগল।

বললে—বিড়ি খাস?

বললাম—না তো।

ঠাস করে একটা চড় মেরে মামা বললে—আবার মিথ্যে কথা—

আমি প্রায় কেঁদে ফেলেছিলাম। কিন্তু মামা বললে—খবরদার, যদি কেঁদেছিস তো তোরই একদিন কি আমার একদিন—

বললাম—সত্যিই বিড়ি খাই না—

মামা বললে—তবে দাঁত এমন কালো কেন রে?

বললাম—লেবেনচুষ খেয়েছি!

মামা বললে—লেবেনচুষ খেয়েছিস! পয়সা কোথায় পেলি? চুরি করেছিস?

—না, দিদিমা দিয়েছে।

মামা যেন বিশ্বাস করতে পারলে না। বললে—দিদিমা পয়সা দিয়েছে? মাইরি বলছিস?

আমি আর কী বলবো!

মামা বললে—বল্ মাইরি বল্? দিব্যি গাল? ক'পয়সা দিয়েছে তোকে?

বললাম—তুটো পয়সা দিয়েছিল দিদিমা, এক পয়সার লেবেনচুষ খেয়েছি, আর একটা পয়সা আছে, এই দেখো—

বলে হাফপ্যান্টের পকেট থেকে বাকি পয়সাটা বার করে দেখালাম। ভাবলাম পয়সাটা দেখে আমায় ছেড়ে দেবে। কিন্তু মামা পয়সাটা আমার হাত থেকে নিয়ে আর একটা চড় মারলে গালে। বললে—ভাগ, পালা, এক-ফুট্‌কে ছেলে এত পয়সা পয়সা বাই কেন রে—

বলে পয়সাটা নিয়ে মামা চলে গেল।

গরমের ছুটির পর আবার একদিন ঘোড়ারগাড়ি চড়ে বাদামতলায় চলে আসি। গাড়ি থেকে নেমেই ভোলাদের বাড়ির দিকে ছুটে যাই। পথেই ভোলার সঙ্গে দেখা।

ভোলা বললে,—কাল আমি তোকে স্বপ্ন দেখেছিলুম জানিস—

—আমাকে?

ভোলা বললে,—তোর ছিপে যেন মস্ত বড় একটা মিরগেল মাছ উঠেছে, তুই টানতে পারছিস না, শেষকালে মাছের ভারে তুই জলে ডুবে গেলি, আর তোকে দেখতে পেলুম না, আমি কাঁদতে লাগলুম খুব—

বললাম,—দূর, আমি জলে ডুবে যাব কেন, আমি তো সাঁতার শিখবো এবার।

ভোলা বললে,—আমিও সাঁতার শিখবো তোর সঙ্গে। কে শিখিয়ে দেবে?

আমি বললাম,—আমার বাবা।

ভোলার বাবা সব সময়ে বাড়ি থাকে না। একমাস তু'মাস দেখা নেই। হঠাৎ একদিন একটা টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে এসে

হাজির হতো। তুষপুকুরের উত্তর পাড় দিয়ে গয়লাদের বাড়ির গা বেয়ে সরু রাস্তাটির ওপর দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে আসতো ভোলার বাবা। ছোট্ট ঘোড়া, দু'পায়ে চটি, দরকার হলে মাটিতে পা ঠেকানো যায় বসে বসে। তারপর সেই ঘোড়ার পিঠে নানা রকম বোঝা চাপানো। লাউ, মানকচু, চিঁড়ে, আরো কত কী! আর ভোলার বাবার এক হাতে থাকতো ছাতা আর একহাতে হুঁকো। হুঁকো টানতে টানতে ভোলার বাবা একহাতে ছাতা নিয়ে সরু রাস্তা দিয়ে আসতো। সেই ঘোড়া দেখে তখনকার দিনে ভোলার বাবাকে আমার ভারী বীর মনে হতো। ভোলার বাবা ঠিক অন্য ছেলেদের বাবার মতো আপিসে যায় না সকাল-বেলা। আমার বাবা, সুজিতের বাবা—এ-পাড়ার সবাই আপিসে যেতো।

—ভোলাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম,—তোর বাবা কোথায় যায় রে ভোলা?

ভোলা বললে,—আবাদে।

আবাদ! সে কোথায়, কেমন ধারা দেখতে, কিছুই জানতাম না। এইটুকু শুধু জানতাম যে সেখানে খুব মানকচু হয়, লাউ হয়, চিঁড়ে হয়। আরও যা-যা জিনিস ভোলার বাবা নিয়ে আসতো সেই সবও হয়।

ভোলা বলতো,—সেখানে ভোলাদের মস্ত বড় বাড়ি আছে। খেলবার মাঠ আছে, গঙ্গা আছে। এই আদিগঙ্গার মতো সরু নয়, সে-গঙ্গায় কুমীর থাকে। বড় বড় মাছ থাকে। অনেক কুলগাছ আছে, ভোলার অনেক বন্ধু আছে সেখানে।

ভোলা বলতো,—আমার বাবার অনেক টাকা আছে। সোনার টাকা, রুপোর টাকা—সিন্দুক ভর্তি সব টাকা আছে—

বলতাম,—এখানে আনে না কেন তোর বাবা?

ভোলা বলতো,—এখানে তো মাটির বাড়ি আমাদের। যদি চোরে চুরি করে নেয়?

সত্যিই ভারী হিংসে হতো ভোলার সৌভাগ্য দেখে। সকলের সৌভাগ্য দেখেই হিংসে হতো। তবু কেউ কোথাও আমার না থাকলেও মনে হতো এই পুকুর, পুকুরের মাছগুলো, বাদামগাছটা, আর ওই কালীঘাট ইস্টিশানের দিকে যে-পাখিগুলো উড়ে যায়, আর সকালবেলা ফিরে আসে, সবই যেন আমার। সকালে আর সন্ধ্যের

আকাশের দিগন্তে যে রঙের মেলা বসে, তাও যেন আমার জন্যে। বাদামতলার পুকুরগুলোতে রোদ-চিকচিক-করা যে ঢেউ ওঠে, সে যেন শুধু আমার জন্যেই। সকালবেলা বইখাতা নিয়ে ইস্কুলে যাবার পথে নর্দমার ধারে হঠাৎ একটা হেলে সাপ দেখে থমকে দাঁড়াই। তারপর সাপটা যে-দিকে পালায়, সেই তির্যকগতির দিকে চেয়ে চেয়ে দেখি—কচুপাতা আর কালকাসুন্দি গাছের ঝোপের মধ্যে একটু শিরশির শব্দ হয়। একটা গাছের ভেতর থেকে হলদে ফুলের লম্বা কুঁড়িটা মাথা তুলে আছে, তার দিকে চেয়েও আশ্চর্য হয়ে থাকি। সবই যেন অবাক করে আমাকে। সবাই যেন আকর্ষণ করে।

একদিন দুপুরবেলা হৈ-হৈ পড়ে গেল বাদামতলায়। হৈ-হৈ পড়ে গেল মেয়েমহলে।

ভোলাদের বাড়িতে এক সাধুবাবা এসেছে, সেই খবর পাড়ার মেয়েমহলে রটে গেল।

সেই খবরটা দিতে দৌড়তে দৌড়তে সোজা এসেছি সুরেশ্বরী-দিদির বাড়িতে। এ-সময়টা সুরেশ্বরীদিদি ছুঁচ নিয়ে সেলাই করতে বসে। রোয়াকটার ওপর ফাটা সিমেন্টের ফাঁক দিয়ে কয়েকটা তুলসীগাছের চারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। শ্যাওলা-পড়া দেয়ালে হেলান দিয়ে সুরেশ্বরীদিদির শ্বশুর তখন পাশে বসে যত রাজ্যের কথা পাড়ে।

—জানো বৌমা, বিপিনের মাথাটা বরাবর খুব পরিষ্কার ছিল, ওর জন্য মাস্টার রাখতে হয়নি কখনো—জানো।

তারপর একটু থেমে আবার বলে,—এ-পাড়ার সেরা ছেলে ছিল কি না বিপিন। ইস্কুলের হেডমাস্টার বলতো, আপনার ছেলে এবার ফার্স্ট হবে দাসমশাই—দেখে নেবেন! আমি আপিস থেকে আসবার সময় গাওয়া-ঘি কিনে আনতুম বিপিনের জন্যে। তোমার শাশুড়ীকে বলতাম, ওকে বেশি করে ভাতে ঘি দিও—

সুরেশ্বরীদিদি বলতো,—আজকাল আর সে-রকম ঘি পাওয়া যায় না—নইলে···

শ্বশুর বলে উঠতেন,—না পাওয়া যাক গে বৌমা, আমার আর ঘিয়ে কাজ নেই, আমার ঘিয়ের শখ খুব মিটে গিয়েছে। আমাদের আপিসের দরোয়ান দেশ থেকে ঘি এনে দিতো, আমরা খুব খেয়েছি

বৌমা, তোমার শাশুড়ী রাত্তির বেলা সেই ঘি দিয়ে লুচি ভেজে দিতেন গরম গরম, কপির ডালনা দিয়ে আমি আর বিপিন সে-সব খুব খেয়েছি। রাঁধতে খাওয়াতে তোমার শাশুড়ীর ক্লান্তি ছিল না।

সুরেশ্বরীদিদি পাশে বসে এক মনে সেলাই করে যেত আর শুনতো অন্ধ শ্বশুরের সেই সব গল্প।

হঠাৎ চিৎকার করে উঠতো শ্বশুর,—তুমি কোথায় গেলে বৌমা, কোথায় গেলে তুমি ?

হঠাৎ যেন অসহায় শিশুর মতো চারদিকে মুখ ঘুরিয়ে চিৎকার করে উঠতো।

—এই তো আমি বাবা, এই তো, কোথাও যাইনি তো আমি!

যেন খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়েছে এমনিভাবে হেসে উঠতো সুরেশ্বরীদিদির শ্বশুর। বলতো,—আমি ভাবলাম তুমি বুঝি কোথাও চলে গেলে—

সুরেশ্বরীদিদি বলতো,—এই আপনার ধুতিটা একটু সেলাই করছিলুম—

—আমার চোখ থাকলে তোমার আর এই দুর্ভোগ হতো না বৌমা। দেখো দিখিনি, কী যে হলো, হাত-পা-পেট সবই ঠিক রইল, শুধু চোখ দুটোই গেল।

তারপর একটু থেমে বলতো,—ও-পাড়ার ওই যে সুরেন চাটুজ্যে, সুরেন চাটুজ্যেকে তুমি দেখোনি বৌমা, দু'জনের আমাদের এক বয়েস, সে এখনও দিব্যি হাটে-বাজারে যায়, বায়স্কোপ দেখে, আর আমার যে কী হলো—

সুরেশ্বরীদিদির শ্বশুরের যখন চোখ ছিল, খেতে পারতেন খুব। ওই সুরেন চাটুজ্যের সঙ্গে ওই বাদামতলার গঙ্গায় গিয়ে সাঁতার কেটেছেন। বিপিনকেও নিয়ে যেতেন। বিপিনকে সাঁতার শিখিয়েছিলেন তিনিই। সকালবেলা আপিসে যেতেন, আসবার সময় খিদিরপুরের বাজার থেকে দু'হাতে কপি, কড়াইশুঁটি, বেগুন, লাউ নিয়ে আসতেন। এই বাদামতলায় তখন মাত্র একটা বাজার ছিল। এ-বাজারে আলুর সের ছিল ছ'পয়সা, খিদিরপুরে পাঁচ পয়সা। তা একটা পয়সাই কি কম! সুরেশ্বরীদিদির শাশুড়ী সেই রাত আটটার সময় আবার নতুন করে উনুনে কয়লা

দিতেন। নতুন করে আবার ঝাল দিয়ে তরকারি হতো। সুরেশ্বরীদিদির শ্বশুর তখন পাশে এসে একটা মোড়ায় বসতেন। বলতেন—পটলের কী দাম বলে জানো গো, বলে আঁট আনা সের। যেন সোনা পেয়েছে—

সুরেশ্বরীদিদির শাশুড়ী বলতেন,—না এনেছ ভালোই করেছ, আট আনা সেরের পটল আর খায় না—

সুরেশ্বরীদিদির শ্বশুর বলতো—একবার ভাবলাম বিপিনের জন্যে নিয়ে যাই। নতুন পটল, ও খেতে ভালোবাসে—

—তোমার খেতে ভালো লাগে, তাই বলো না, বিপিনের কথা বলছ কেন?

সুরেশ্বরীদিদির শাশুড়ী রাঁধতে রাঁধতে কড়ায় একপলা তেল ছেড়ে দিতেন।

শ্বশুর রেগে যেতেন। বলতেন,—পটল আমি খুব খেয়েছি, আমাদের দেশের পটল তুমি খাওনি, গাঙের ধারে গাছ-পাকা পটল, সে কলকাতায় আর দেখতে পাই না, আমাদের দেশে এ-পটল মালোরা এসে এমনি দিয়ে যেত। এ-পটল আর সে-পটল? সে-পটলের 'তার'ই আলাদা—

শাশুড়ী রাঁধতেন আর শ্বশুর পাশে বসে বসে গল্প করতেন। তখন চোখ ছিল।

বলতেন,—পটলগুলো আর একটু ভাজ গো, ভাজলে খেতে ভালো লাগে।

শাশুড়ী রেগে যেতেন। বলতেন,—তুমি আর বকর-বকর করো না, তুমি যাও দিকিনি, আপিস থেকে খেটে খুটে এলে, কোথায় একটু জিরোবে, তা না মেয়েমানুষের মতো রান্নাঘরে বসে···যা দু'চক্ষে দেখতে পারিনে, তাই হয়েছে···। বিপিন পড়ছে, ওকে গিয়ে একটু পড়ালেই পারো।

তখন চোখ ছিল তাঁর। তখনও কিন্তু সময় পেলেই ঘুরঘুর করে রান্নাঘরের কাছে এসে দাঁড়াতেন। তেল মাখতেন রান্নাঘরের কাছে দাঁড়িয়ে। আপিসটা তাঁর রান্নাঘরের পাশে হলেই যেন ভালো হতো!

তা সুরেশ্বরীদিদি শাশুড়ীকে দেখেনি।

শ্বশুর বলতেন,—জানো বৌমা, আমি এই রান্নাঘরের পাশে

সারাদিন থাকতাম বলে তোমার শাশুড়ী কিন্তু আমাকে বকতেন খুব—

খেতে বসে বলতেন,—এটা কীসের তরকারি বৌমা ?

—লাউঘণ্ট !

শ্বশুরের অমনি অতীতের কথা মনে পড়ে যেত।

বলতেন—আহা এই লাউ, এ কি আর লাউ ? দেশে আমাদের একটা লাউ ছু'হাতে তুলে ধরতে পারতাম না, এত বড়—তা বিপিনকে লাউঘণ্ট দিয়েছ বৌমা ?

সুরেশ্বরীদিদি বলতো,—উনি তো আজকে সকাল-সকাল গিয়েছেন—

—আহা বেশ রেঁধেছ বৌমা, ওর জন্যে একটু রেখে দিও তুমি।

আমরা তখনকার বিপিনদাকে দেখিনি। দেখলাম অনেক পরে। তখন বাদামতলার সঙ্গে সুরেশ্বরীদিদির সব সম্পর্ক ঘুচে গিয়েছে। বিপিনদা এল একদিন। একমুখ দাড়িগোঁফ। প্রভাস নাপিত এল কামাতে। আমরা যখন খবর পেলাম, তখন দেখি দাড়িগোঁফ কামানো হয়ে গিয়েছে।

বললে,—এ কে রে ? চিনতে পারছি না তো ?

ভোলা বললে,—ও মিত্তিরদের বাড়ির ছেলে।

বিপিনদা বললে,—বটুক মিত্তির কে হয় তোর ?

বললাম,—ঠাকুর্দা ?

বিপিনদার সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছিলাম। সুরেশ্বরীদিদি তখনও বউ হয়ে আসেনি।

দাসমশাই বাদামতলার বহুকালের লোক। সেই দাসমশাই-এর ছেলে, বি-এ পাশ করেছে। আর ইস্কুলও তখন ছোট ছিল। সেইখানেই বিপিনদা মাস্টারি পেয়ে গেল। রাশভারী মানুষ। বিপিনদা ইস্কুলে যেত আর ছেলে পড়াতো। কিন্তু পড়াতে পড়াতে এক একদিন সময়ের হিসেব ভুল হয়ে যেত তার। যখন অন্য মাস্টাররা টিফিনরুমে খবরের কাগজ পড়তো, পান-বিড়ি খেতো, বিপিনদা তখন একধারে বসে বসে পড়তো ভূগোলের বই, সংস্কৃত হিতোপদেশ, কিংবা পঞ্চতন্ত্র। হিস্ট্রি, ভূগোল, অঙ্ক—মাস্টারদের সবই পড়াতে হবে বাদামতলার ইস্কুলে। বিপিনদা ভালো ছেলে, সব বিষয়েই জানাশোনা আছে। দাসমশাই আপিসে চাকরি করেন, ছেলে মাস্টারি

করছে, বাড়িতে কিন্তু দেখা শোনা করবার কেউ নেই। দাসমশাই শেষে একদিন ছেলের বিয়ে দিলেন। বাদামতলার দশবাড়ির লোক নেমন্তন্ন খেয়ে গেল। সেই তখন বউ হয়ে এল সুরেশ্বরীদিদি—

গল্প শুনতে শুনতে জিজ্ঞেস করতাম—তারপর কি হলো?

সুরেশ্বরীদিদি বলতো,—তারপরের কথা পরে বলবো, এখন তুই যা দিকি, এবার বাবাকে খাবার দিতে হবে—

—কিন্তু বিপিনদা কেন চলে গেল, তুমি কিছু জানো না?—

সুরেশ্বরীদিদির শ্বশুর বোধহয় এতক্ষণে শুনতে পেতেন। বলতেন,—ও কে গো বৌমা? কার গলা শুনছি যেন, বটুক মিত্তিরের নাতি বুঝি?

সুরেশ্বরীদিদির সঙ্গে গল্প করার মস্ত বাধা ছিল ওই শ্বশুর। বুড়োর সবদিকে কান। কোনও শব্দ এড়াবে না, কোনও গন্ধ লুকোনো যাবে না। বড় বিপদ হতো সুরেশ্বরীদিদির শ্বশুরকে নিয়ে। দিনরাত কেবল বৌমা আর বৌমা! সারাদিন কেবল সুরেশ্বরীদিদিকে খাটিয়ে মারতো বুড়ো। মনে হতো শ্বশুর মরে গেলে যেন সুরেশ্বরীদিদি বাঁচে।

বাবা বলতো,—ছেলেটা নিরুদ্দেশ হবার পর থেকেই বুড়োর চোখ অন্ধ হয়ে গেল কিনা—

আর সে কি যেমন-তেমন ছেলে। হীরের টুকরো ছেলে। পাড়ার মেয়েরা বলতো,—ওই বউ-এরই দোষ দিদি। বউ-এর দোষেই দাসমশাই-এর ছেলে বিবাগী হয়ে গেল।

আর ঠিক বিবাগী হলো কি সন্ন্যিসী হলো, কি মারা গেল তাও কেউ জানে না। যখন বারো বছর কেটে গেল, সুরেশ্বরীদিদি গায়ের গয়না, মাথার সিঁদুর সব ত্যাগ করলে। আমরা বাদামতলায় যখন ছোটবেলায় সুরেশ্বরীদিদিকে দেখেছি, তখন সুরেশ্বরীদিদি নিরিমিষ খায়, বিধবার মতন সব আচার-বিচার।

বিপিনদাও সত্যি সেদিন বলেছিল—কাউকে আর বিশ্বাস নেই কাকাবাবু।

হিমালয় কিংবা গোমুখী কিংবা কেদারবদরী, অমনি একটা কোন্ জায়গার নাম যেন করেছিল বিপিনদা।

ফটিক-কাকাবাবু বললেন—তা আমরা ভাবলাম কোথায় গেলে

তুমি, পুলিশেও খবর দেওয়া হলো। তোমার জন্য ভেবে ভেবে অঘোরদা তো শেষকালে অন্ধ হয়ে গেলেন—

জ্যাঠামশাই বললেন,—তা বিপিন, তুমি চলেই বা গিয়েছিলে কেন শুনি ?

বিপিনদা বললে— এমনি !

—এমনি মানে ? কোনও কারণ তো থাকবে ? তোমার বউ, তোমার বাবা, সবাইকে ফেলে এমনি চলে গেলেই হলো ? একবার ভাবলে না তাদের কী দশা হবে ? অঘোরদার তো ওই সতেরো টাকা পেনশনের ওপর ভরসা, সতেরো টাকায় কি আজকাল কারও চলে ? তোমার মতো উপযুক্ত ছেলে থাকতে শেষ-জীবনে বড় দুর্ভোগ পোয়াতে হলো তোমার বুড়ো বাবাকে ! নেহাত বৌমা ছিলেন—তা বৌমার···

বিপিনদা যেন রেগে গেল। বললে,—বৌমার নাম আর করবেন না জ্যাঠামশাই আমার সামনে।

সুরেশ্বরীদিদির ভাগ্য ভালো, সে-সব কথা কান দিয়ে শুনতে হয়নি তার। মনে আছে সুরেশ্বরীদিদির ঘরে গিয়ে দেখেছি ছোট দু'জনে-শোবার মতো একটা খাট। পাশের দিকে একটা আলনায় থাকতো সুরেশ্বরীদিদির খানকয়েক কাপড়। আর খাটের মাথার দিকের দেয়ালে ছিল বিপিনদার একটা ফটো। ফটোর গায়ে একটা ফুলের শুকনো মালাও ঝুলতে দেখেছি। দু'-একটা চন্দনের টিপ পায়ের দিকের কাচের ওপর লেগে থাকতো।

আমি অনেকদিন জিজ্ঞেস করেছি,—কেন, বিপিনদা পালিয়ে গেল কেন, সুরেশ্বরীদিদি ?

কিন্তু কোনও দিন তার জবাব আদায় করতে পারিনি সুরেশ্বরীদিদির কাছ থেকে। হয়তো কারণটা সুরেশ্বরীদিদি জানতো, হয়তো জানতো না। কিম্বা হয়তো জেনেও বলতো না।

সুরেশ্বরীদিদির শ্বশুর সেদিন যথারীতি আপিস থেকে এসেছেন ; এসে নিজের হিসেবের খাতা, হাবিজাবি কাগজপত্র নিয়ে বসেছেন। বিপিন সেই সময়টা পাড়ায় ছেলে পড়াতে যায়। আসে রাত আটটা-ন'টার সময়। রোজ এমনি। কোনওদিন ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু সেদিন হঠাৎ আর এল না।

খেতে বসে শ্বশুর জিজ্ঞেস করলেন—বৌমা, বিপিন খাবে না ? বিপিন আসেনি ?

সুরেশ্বরীদিদি বললে,—এখনও তো আসেননি !

—কোথাও দূরে গিয়েছে ? কিছু বলে গিয়েছে ?

সুরেশ্বরীদিদি বলেছে,—না।

রাত বাড়লো। বাদামতলার পাড়ায় তখন রাত হলেই গাঙ্গুলীদের বাঁশঝাড় থেকে শেয়াল ডাকতো। যেখানটায় সুরেশ্বরী-দিদিদের বাড়ির পেছনে আমড়া গাছ ছিল, বাঁশঝাড়টার সীমানা ছিল ওই পর্যন্ত। একে একে নিঃঝুম হয়ে এল সমস্ত পাড়টা। কুলপি-বরফওয়ালা প্রথমে সন্ধ্যেবেলা একবার আসতো, তারপরে আর একবার আসতো অনেক রাত্রে। শেষবারের মতো সেও হেঁকে চলে গেল। শ্বশুর বললেন,—আমি একবার বাইরে যাচ্ছি বৌমা, দেখি খোঁজ পাই কি না—

খোঁজ পাওয়া অবশ্য যায়নি সেদিন রাত্রে। অনেক রাত্রে শ্বশুর খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে এসে বিছানায় শুয়ে পড়েছিলেন। বুড়ো মানুষ, আপিসের খাটুনির পর ঘুমিয়েই পড়েছিলেন সে-রাত্রে। সুরেশ্বরীদিদি জেগে জেগে শ্বশুরের নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেয়েছিল শুধু। তারপর চোখের ওপর দিয়েই রাতটা কেমন করে কাটে, তা বুঝি একা সুরেশ্বরীদিদিই জানতে পেরেছিল সেদিন।

কিন্তু পরদিনও আসেনি সুরেশ্বরীদিদির স্বামী।

হেডমাস্টারমশাই পাড়ার লোক। বললেন,—আমার কাছে দুপুর ছুটোর সময় বিপিনবাবু এসেছিলেন, বললেন খুব মাথা ধরেছে, ছুটি চাই, তা তাই তো ছুটি দিয়ে দিলাম, কিন্তু তারপর তো আর কিছু জানি না !

সংস্কৃত ক্লাশের ছেলেরা বললে,—মাস্টারমশাই বললেন তোমরা চুপ করে থাক, আমার শরীরটা বড় খারাপ লাগছে।

লতা শব্দের ধাতুরূপ পড়ানো হচ্ছিল। যেমন রোজ হয়। প্রত্যেকের পড়া ধরেন। বড় কড়া মাস্টার বিপিনবাবু। কারও পার পাবার উপায় নেই বিপিনবাবুর ক্লাশে। সেদিনও ঠিক সময়ে ক্লাশে এসেছেন। পড়ানো চলেছে। ছেলেরা সব চুপচাপ শুনছে। হঠাৎ বই বন্ধ করে উঠলেন চেয়ার ছেড়ে। বললেন,—তোমরা চুপ করে থাক, আমার শরীরটা বড় খারাপ লাগছে আজ—

তারপর সোজা একেবারে চলে গেলেন হেডমাস্টারের ঘরে। বললেন,—মাথাটা বড় ধরেছে, আমি বাড়ি চলে যাচ্ছি—

তারপর কেউ দেখেছে বাদামতলার গঙ্গার ধারে বিপিনবাবু একলা একলা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। খড়ের নৌকোগুলো যেখানে জমা হয়, জটলা করে, সেইখানে একেবারে কাদামাটির শেষ ধাপে কেউ কেউ একলা বসে থাকতে দেখেছে তাঁকে।

প্রভাস নাপিত বাড়ি যাচ্ছিল। বললে,—এখানে একা একা কী করছেন মাস্টারমশাই ?

বিপিনবাবু বললেন,—এমনি একটু বসে আছি।

সন্ধ্যাবেলা কালীঘাট স্টেশনের প্ল্যাটফরমে ওভারব্রীজের ওপর বিপিনবাবুকে একজন বসে থাকতে দেখেছে। সেইখানে অমন অসময়ে বসে থাকতে দেখে একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল সে। ভাবলে, হয়তো হাওয়া খেতে এসেছেন। কেমন যেন উদাস উদাস চেহারা। তবু কিছু জিজ্ঞেস করেনি। বাদামতলার ফণি আসছিল ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করে। তাকে শুধু জিজ্ঞেস করেছিল একবার,—হ্যাঁরে, মাস্টারমশাই অমন ওভারব্রীজে বসে আছেন কেন বল তো ?

ফণি বলেছিল,—বোধ হয় সিনারি দেখছেন মাস্টারমশাই—

এর পরে আর কেউ দেখেনি বিপিনবাবুকে। সে-সব অনেকদিন আগের ব্যাপার। আমরা তখন ছোট। সব কথা পরে শুনেছি। আমি যখন সবে বাড়ি থেকে একটু বেরোতে শিখেছি, তখন সুরেশ্বরীদিদিদের বাড়ির দক্ষিণের মাঠে শিশুগাছের তলায় ডাংগুলি খেলার আড্ডায় আমাদের আসর জমতো। ভোলা আসতো, কার্তিক আসতো, সুজিত আসতো। তারপর যখন ভোলার দিদি ভোলার সঙ্গে মিশতে দিতো না, সুজিতের বাবা সুজিতের সঙ্গেও আমাকে মিশতে দিতো না, তখন একেবারে একলাই হয়ে গেলাম। একেবারে একলা। ঠিক সেই সময়ে একদিন আমড়া গাছে উঠে আমড়া পাড়তে গিয়েই ধরা পড়ে গেলাম সুরেশ্বরীদিদির কাছে। আর সেই সময়েই ভোলার দিদির ভারী একটা অসুখ হলো।

খুন্তীদি'র সে এক ভীষণ অসুখ। প্রথম প্রথম পাড়ার মণি ডাক্তার দেখতো। ভোলার বাবা আবাদে থাকতো। বাড়িতে থাকতো ভোলার দিদি, ভোলা আর ভোলার বিধবা পিসী।

প্রথমে ভোলা একদিন বললে,—জানিস, দিদির অসুখ করেছে খুব—

বললাম,—বেশ হয়েছে, তোর দিদিটা ভারী দুষ্টু। আজ পেল্লাদ চৌধুরীদের পুকুরে কাঁকড়া ধরবো, চল্।

প্রথম ক'দিনই খুব তো আরাম। কেউ আমাকে বকবার নেই, কিন্তু একদিন ভোলার মুখখানা খুবই গম্ভীর মনে হলো। ভোলা বললে,—আমার দিদি আর বাঁচবে না, ডাক্তার বলেছে—

আমার মনে কিন্তু খুব আনন্দ হলো কথাটা শুনে। মরে গেলে আমার তো ভালোই। আরাম করে ভোলাদের বাড়িতেই আড্ডা দেবো। ভোলাদের বাড়ির পুকুর-ঘাটে বসেই মাছ ধরা যাবে। পেল্লাদ চৌধুরীদের দরোয়ান ধরতে এলেই পালিয়ে যাব বাড়ির ভেতর। কেউ আর দেখতে পাবে না।

আজ ভাবি, কোথায় গেল সেই পেল্লাদ চৌধুরীদের দারোয়ান। বহুকালের লোক চৌবেজী! তিলক-টিলক কাটতো। ভারী ভক্তি ছিল ভগবানে। দূর থেকে দেখতাম, দেউড়িতে বসে রাম-চরিত পড়ছে। পুরুষানুক্রমে দরোয়ানগিরি করে আসছে চৌবেজীরা। চৌধুরীদের বাড়ির সামনে একটা ছোট ঘরে তক্তপোষের ওপর চৌবেজী রাত দশটা-এগারোটা পর্যন্ত চিৎকার করে করে রাম-চরিত পড়তো। পাড়ার খাটালের হিন্দুস্থানীরা, বাদামতলার বাজারের মুটেরা, তারপর ঠেলাওয়ালারা এসে ভক্তিভরে সেই পাঠ শুনতো। আমরা সকলে কোনও কোনওদিন গেলে প্রসাদ পেতাম—বাতাসা আর পেঁড়া!

এমনিতে চৌবেজী বেশ লোক। কিন্তু চৌধুরীদের আরও অনেক কারবারের মতো মাছেরও কারবার ছিল। বাদামতলার পুকুরে পুকুরে মাছের ডিম ছাড়তো চৌধুরীরা। সেই ডিম বড় হতো, তারপর বাজারে বিক্রি হতো। দুপুরবেলা চৌবেজী পুকুরগুলো পাহারা দিয়ে দিয়ে বেড়াতো।

আমরা ভোলাদের বাড়ির পেছনে ভ্যারেণ্ডা গাছের আড়ালে বসে হয়তো দু'জনে চুপি-চুপি ছিপ ফেলেছি, হঠাৎ দূরে কার্তিকদের বাড়ির গলিটা দিয়ে চৌবেজীকে আসতে দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গে দে-ছুট!

কিন্তু সেই চৌবেজীও শেষকালে চৌধুরীদের এক নাতনির কানের দুল চুরি করে পুলিশের হাতে···

কিন্তু সে-কথা এখন থাক্!

বাদামতলার চৌধুরীদের ইতিহাস লিখতে গেলে সে আর এক মহাভারত হয়ে যাবে। এখানে সে-কথা না তোলাই ভালো। শুধু মনের পটে যাদের ছাপ আর কিছুতেই মুছতে পারিনি আজ তাদের কথাই বলবো তোমাদের। নইলে সকলের সব কথা তোমরাই কি শুনতে পারবে!

বাদামতলা ছিল আমার কাছে যেন হাতের পাঁচ। যখন সব হারিয়ে নিঃশেষ হতাম, যখন সব ফুরিয়ে নিঃস্ব হয়ে যেতাম, তখনই ফিরে আসতাম কেবল বাদামতলায়। বাদামতলা আমার শেষ সম্বলও বটে! বাদামতলা আমার কাছে ছিল পরমাত্মীয় আর মামারবাড়ি ছিল আমার পরমাত্মা। বাঘা-মামাকে দেখে ভয় পেতাম বটে, কিন্তু ভালোও বাসতাম বাঘা-মামাকে! সেই বাউণ্ডুলে লোকটির জন্যে আমার সেই ছোটবেলাতেও কেমন যেন একটা মায়া ছিল। বাঘা-মামার সব থেকেও যেন কিছু ছিল না। দিদিমার মতো মা, আর বৈষ্ণবদাস সিংহীর অতবড় বাড়ি, তাই-ই বা ক'জনের থাকে? তবু মনের কোন্ কোণে বোধহয় আমার জন্যে একটু স্নেহ ছিল তার। একদিন কী জানি কী দয়া হলো মামার। গরমের ছুটির সময় গিয়েছি গোয়ালটুলিতে একবার। বাঘা-মামার ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই। বাড়ির ভেতর ঢুকলেই আমি মিনিদের বাড়ি চলে যাই। সেদিন হঠাৎ খিড়কীর কাছে বাঘা-মামা আমার হাতটা ধরে ফেলেছে। বললে—এত সকালে কোথায় যাচ্ছিস রে ছোঁড়া?

বললাম—মিনিদের বাড়ি!

বাঘা-মামা ঝাঁঝিয়ে উঠলো। বললে—ওদের বাড়িতে এত কীসের রস শুনি? দু'জনে মিলে বিড়ি খাস বুঝি?

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললাম—না, আমরা তো বিড়ি খাই না—

বাঘা-মামার যেন বিশ্বাস হলো না—বল্, মা-কালীর দিব্যি, বল্?

বললাম—মা-কালীর দিব্যি বলছি, বিড়ি খাই না—

মামা যেন অবাক হয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বললে—

ভেরি গুড়,—বিড়িটা ছোটলোকের নেশা, ও-সব নচ্ছার জিনিষ,—তোকে আমি অন্য একটা নেশা শিখিয়ে দেবো আজ, জানলি—

কোথায়যেন তখনও বাঘা-মামার মনে একটু আভিজাত্য ছিল। ভুলতে পারতো না যে বাঘা-মামা বৈষ্ণবদাস সিংহীর বংশধর। তাই মাতাল অবস্থাতেও সেই অহঙ্কারে বুঝি বুক ফুলিয়ে থাকতো।

যাবার সময়ে বললে—সন্ধ্যেবেলা তোকে ডাকবো, কাউকে বলিসনি যেন—

কথাটা কাউকেই সেদিন বলিনি সত্যি। বাঘা-মামার কাছ থেকে আদর পাবার লোভ ছিল আমার দুর্বার। সন্ধ্যেবেলা চুপি চুপি আমায় ডেকে নিয়ে গেল বাঘা-মামা। দিদিমা তখন রান্নাঘরে। মা কলতলায়। বললাম—কোথায় যাব বাঘা-মামা?

বাঘা-মামা বললে—আয় না আমার সঙ্গে—

সিংহী বাড়ির পেছনে অনেকগুলো পোড়ো ঘর ছিল। সে-ঘরগুলো কোনও কাজে লাগতো না। ঘরের ভেতর কোনও জিনিষ ছিল না, তাই দরজায় তালা দেবারও বন্দোবস্ত ছিল না। বাঘা-মামা আমাকে একটা ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। এ-দিকটায় কখনও আসিনি আগে। আসতে ভয় করতো সকলের। দেখি, ঘরের মধ্যেখানটা ধুলো-টুলো ঝেড়ে বেশ বসবার জায়গা করেছে বাঘা-মামা। মধ্যেখানটায় দু'-একটা চট্ পরিপাটি করে পাতা। ঘরের দেয়ালে ঝুল ঝুলছে। এক পাশে একটা দই-এর খালি হাঁড়িতে কয়েকটা খালি কল্কে, নারকোল দড়ি, দেশলাই।

বাঘা-মামা হাঁড়ি থেকে সেগুলো বার করলে। তারপর কল্কে সাজতে লাগল। আমার জ্যাঠামশাই তামাক খেতো। কিন্তু এ-কল্কেগুলো তেমন বড়-বড় নয়। খুব সরু। পোড়া-মাটির তৈরি। তারপর নারকোল ছোবড়া পাকিয়ে নুড়ি তৈরি করলে। তারপর ভিজে নেকড়া দিয়ে কল্কের তলাটা জড়িয়ে নিয়ে দু'হাতে কল্কেটা মুখের কাছে ধরলে। তারপর বললে—ওপরে আল্‌তো করে দেশলাইটা জ্বেলে ধরিয়ে দে তো—

জিজ্ঞেস করলাম—কোথায় ধরাবো?

বাঘা-মামা বললে—ঠিক ছোবড়াতে—

আগুন দিয়ে ছোবড়া ধরাতেই বাঘা-মামা চোঁ চোঁ করে দম্-টান দিতে লাগল। টানের সঙ্গে টান। যতবার দম্ টেনে

ছেড়ে দেয়, ততবার বেশ জোরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে কল্‌কের মাথায়। দম্ টানতে টানতে বাঘা-মামার গলার শিরগুলো বেরিয়ে পড়বে মনে হলো। তারপর একসময়ে ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ঘর যখন অন্ধকার হয়ে উঠলো, বাঘা-মামা লম্বা করে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে—নে—

আমার দিকে বাঘা-মামা কল্‌কে এগিয়ে দিলে।

বললে—নে, নে, দেরি করিস নে, চিলিম্ নিবে যাবে—নে ধর—

বললাম—আমি এ খেতে জানি না মামা—

বাঘা-মামা বললে—আমি শিখিয়ে দেবো তোকে, কিচ্ছু ভাবনা নেই—টান, টেনে দেখ্, তোর বিড়ির চেয়ে ভালো—

মনে আছে আমার ওপর সেদিন বাঘা-মামার সে কী স্নেহ! সে কী আদর! বাঘা-মামার মনে যে আমার জন্যে এত স্নেহ, এই প্রীতি লুকিয়ে ছিল, তা এর আগে কখনও টের পাইনি।

বললে—লক্ষ্মী বাবা আমার, এই তো, বেশ হচ্ছে, এইবার আর একটু জোরে টান।

আরো একটু জোরে টান দিলুম।

বাঘা-মামা পিঠ চাপড়ে দিলে আনন্দে। বললে—বেড়ে ভাই, বেড়ে, মামার নাম রাখতে পারবি তুই, এইবার মুখ টিপে নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড় দিকিনি—দেখি—

কিন্তু সেই নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে গিয়েই বিপদ বাধলো। মনে হলো যেন দম আটকে গেল আমার। আমি কাশতে কাশতে একেবারে টলে পড়লাম মেঝের ওপর। তারপরে আর কী ঘটেছে তা আমার মনে নেই।

শুধু যেন অস্পষ্ট ভাসা-ভাসা গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম বাঘা-মামার। মামা যেন আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, সুস্থ করবার চেষ্টা করছে, ভরসা দিচ্ছে।

বলছে—প্রথম প্রথম একটু অমন হবে, কিন্তু একটু অভ্যেস কর, সব সহ্য হয়ে যাবে—

তখনি আমি বলেছিলাম—আমি খাবো না—

বাঘা-মামা বলেছিল—দেখবি খেলে মাথাটা সাফ হয়ে যাবে আমার মতো—

বলেছিলাম—মা যদি বকে?

—দূর ছোঁড়া, এ খেলে ইস্কুলে অঙ্কতে ফাস্ট্ হবি যে, তখন বাঘা-মামার কথা মনে করিস—কিন্তু কাউকে যেন বলিসনি, বললে তখন সব্বাই অঙ্কতে ফাস্ট্ হতে আরম্ভ করবে—

কিন্তু সেদিন শেষকালে যা কাণ্ড! যখন জ্ঞান হলো দেখি আমি হাজরা-ডাক্তারবাবুর টেবিলে শুয়ে আছি। আর কম্পাউণ্ডারবাবু আমার নাকে যেন কী শুঁকোচ্ছে। আমি চারদিকে চোখ চেয়ে দেখলুম। দিদিমা ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সকলের মুখে চোখে কেমন উদ্বিগ্ন ভাব।

ডাক্তারবাবু সামনে ঝুঁকে পড়ে বললেন—আমাকে চিনতে পারছো খোকন?

মনে আছে সেই থেকে নিয়ম হয়ে গেল মামারবাড়িতে গেলে রাত্রে আমি থাকবো মিনিদের বাড়িতে।

কাকীমা বললে—বেশ তো, খোকনকে আমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেবেন মাসীমা, ও কি পর!

মা বললেন—না ভাই, তোমাদের বাড়িতে গিয়ে দিনরাত জ্বালাতন করবে কেবল, আমিই বরং তারচেয়ে বাদামতলায় চলে যাই—বুড়ো মা'র জন্যেই আসা—মা'র কাছে দুটো দিন থাকবো তারও জো নেই। মা'কে তো বলি, তুমি আমার কাছে গিয়ে থাকো, তোমার কিছু অসুখ-বিসুখ হলে তখন কে তোমাকে দেখবে এখানে!

দিদিমা বলতো—এ-বাড়ি ছেড়ে দু'দণ্ড কোথাও গিয়ে শান্তি পাইনে মা! ছেলে আমাকে মারুক ধরুক খেতে পরতে না দিক, তবু তো ছেলে, দশমাস দশদিন তো গভ্যে ধরেছি ওকে—

—কিন্তু কোন্‌দিন দাদা তোমাকে খুন করে ফেলবে, দেখো—

দিদিমা বলতো—তা ফেলুক, তাই যদি ওর ধর্ম হয় তো হোক, আমার কোনও ক্ষেতি নেই! এই যে এখন, আমি আছি বলেই তো বাড়িতে আসে! দু'দিন ঘুরে ঘুরে যখন কোথাও খেতে পাবে না, খিদের জ্বালায় পেট চোঁ চোঁ করবে তখন ঠিক বাড়িতে আসবে। ওর মুখটা দেখে প্রাণটা তো আমার জুড়োয় তবু—

কোনও দিন একটা কাঁসার থালা, কোনও দিন একটা শ্বেতপাথরের বাটি, কোনও দিন বা দিদিমার পেতলের ভারী পিলসুজটা আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

দিদিমা বলে—হ্যাঁরে খুকি, আমার ফেরো ঘটিটা কোথায় গেল দেখেছিস ? পাচ্ছিনে তো মা !

আবার কিছুদিন পরে ঠিক ওমনি। দিদিমা বলে—পেতলের গামলাখানা কোথায় গেল রে খুকি ?

এ-শুধু আজ নয়। বহুদিন আগে থেকেই, যা-কিছু হারায় কিছুতেই আর তার খোঁজ পাওয়া যায় না। এমনি করে দাদামশাই-এর রুপো বাঁধানো গড়গড়াটাও একদিন হারিয়েছিল। বদন স্যাকরার কাছ থেকে সাড়ে বারো ভরি রুপো দিয়ে দাদামশাই বাঁধিয়েছিলেন। দিদিমার কাছে শুনেছি দাদামশাই-এর নাকি ভারি পান-তামাকের নেশা ছিল। দামী দামী তামাক আসতো তাঁর জন্যে ! তামাকের গন্ধে গোয়ালটুলির সারা অঞ্চলটা সে-যুগে ভুরভুর করতো।

রাত্তিরবেলা বিছানায় ঘুম আসবার আগে দিদিমা সেই গল্প করতো !

বিছানাটার একপাশে মা শুয়েছে, এক পাশে দিদিমা আর মাঝখানে আমি। সমস্ত বাড়ির তিরিশ চল্লিশখানা ঘর, শোবার আগে ভালো করে পরীক্ষা করে তালা-চাবি বন্ধ করে দিয়েছে। বেড়ালের উৎপাতের জন্যে রান্নাঘরের শেকল টেনে দেখেছে বারবার। তেকাটায় কড়াতে দুধ আছে। বেড়ালে খাবে। লম্পটা নিয়ে দিদিমা সারা বাড়ি ঘুরে ঘুরে সব জানলা-দরজা দেখতো !

বলতো—এইটে ছিল কর্তাদের বৈঠকখানা, জানলি—তুই তখন হোস্‌নি ! তা তোর মা-ই দেখেনি তো তুই !

—এই দেখ, এই ঘরে মস্ত এক ঝাড় ঝুলতো, মোমবাতি জ্বেলে দিলে ঝক্‌মক্ ঝক্‌মক্ করতো—

—সে-সব কী হলো, দিদিমা ?

দিদিমা আবার বলতো—এই দেখ, এই বার-বাড়ির উঠোনে যখন যাত্রা-পাঁচালী সব হতো, আমরা এইখানে চিকের আড়ালে বসে বসে সব দেখতাম ! আর এই দেখ, কাশী থেকে যখন গুরুদেব আসতেন, এই ঘরে থাকতেন—। তোর দাদামশাই-এর একটা আবলুশ কাঠের জলচৌকি থাকতো এখানে, এই জলচৌকিতে বসে বসে তেল মাখতেন তিনি। আর একজোড়া সোনা-বাঁধানো খড়ম ছিল, সেইটে থাকতো এখানে—

আমি সারা বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখতাম আর মনে হতো এই খানিকক্ষণের জন্যে সবাই বুঝি কোথাও গিয়েছে। এখুনি তারা ফিরে আসবে আর সব আগেকার মতো হয়ে উঠবে। আবার এই উঠোনে যাত্রা হবে পাঁচালী হবে, রাজা-রানীরা আবার উঠোনে এসে বক্তৃতা শুরু করে দেবে। এ-বাড়ির কনে-বউ চিকের আড়ালে বসে ঘোমটা দিয়ে সব দেখবে। ননদ, ননদাই, ভাসুরঝি, বোন-পো, খুড়ীমা, জ্যাঠাইমাতে ভর্তি হয়ে যাবে আবার। ওদিকে রান্নাঘর থেকে লুচিভাজার গন্ধ আসবে, অন্নপূর্ণা পুজোর দিন লোকজন আত্মীয়-স্বজনরা উঠোনে দাওয়ায় রোয়াকে খেতে বসবে। ঠাকুর-দালানে প্রতিমার সামনে থালায় বারকোষে নৈবিদ্যি সাজানো হবে। নতুন কনে-বউ আলতা পরে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে ঘুর-ঘুর করবে।

—এই দেখ, এইটে ছিল আমার শোবার ঘর, তোর দাদামশাই আর আমি শুতুম এই ঘরে।

নতুন বউ-এর প্রথম ছেলে হবে। সাধেরই বা কী ঘটা। ওই শাঁখারীপাড়া কাঁসারীপাড়া পোড়াবাজারের জানাশোনা সব বাড়ির বউরা এসে নেমন্তন্ন খেয়ে গেল। তারপর আঁতুড়ঘর হলো ওই রান্নাঘরের পেছনে। দাই এল। তখন অমাবস্যার রাত। মাঝ-রাত্তির, কর্তা তো তামাক খেয়ে শুতে গেলেন। আমার তখন আর জ্ঞান নেই।

যখন ভোর হলো দাই বললে—বেটাছেলে হয়েছে গো—

ওই বাঘা হলে সেবার। ফুটফুটে চেহারা, যেমন রঙ তেমনি চেহারা। সবাই বললে—সিংহী বংশের মান রাখবে এই ছেলে—

তা মানই রাখলো বটে বাঘা। সেই দাদামশাই, দিদিমা, জ্যাঠামশাই, জ্যাঠাইমার যা কিছু ছিল সব ওই ছেলেই একে একে পাচার করেছে! সোনা-বাঁধানো খড়ম আর রুপো-বাঁধানো গড়গড়া নিয়েই প্রথম আরম্ভ হয়েছিল, তারপর সেই আবলুশ কাঠের জলচৌকি, ছাদের কড়িকাঠে ঝোলানো ঝাড়লণ্ঠন থেকে শুরু করে তখন কাঁসার থালা, ফেরো ঘটি, পেতলের গামলাতে এসে নেমেছে।

সেই কতদিন আগে গোয়ালটুলির এই জায়গায় এ-বংশের প্রথম বিখ্যাত মানুষটি এই গঙ্গারঘাটে এসে ধান-চালের কারবার

শুরু করেছিলেন তার সাল তারিখ দিদিমার জানা ছিল না। শুধু জানা ছিল তার নাম বৈষ্ণবদাস সিংহ। গলায় কণ্ঠি পরতেন, খালি পা, খালি গা। হাতে মালা। যখন কাজ থাকতো না বসে বসে মালা জপতেন। চাটগাঁ বরিশাল আর ফরিদপুর থেকে বড় বড় নৌকো পদ্মা পার হয়ে গঙ্গার মোহানা দিয়ে এইখানে এসে থামতো, এই ঘাটে। মাল খালাস করে আবার ফিরে চলে যেত।

কিন্তু একদিন বড় হঠাৎ তাঁর ভাগ্য উদয় হলো।

ওই যেখানে হরিণ বাড়ির জেল—যেখানে এখন মহারানী ভিক্টোরিয়ার পাথর-গাঁথা মন্দিরটা হয়েছে, আর ওই পোড়াবাজার, যেখানে বড় বড় বাড়ি আকাশ ছোঁওয়ার উপক্রম করছে—ও-সব ছিল জঙ্গল। এখন যেখানে চাউল পটির মোড় পেরোলেই ট্রামের বাসের ঘড়ঘড় শব্দ ওঠে—ওখানেও ছিল জঙ্গল। চারিদিকে জঙ্গল —ওপারে এপারে—শুধু এইখানটায় বৈষ্ণবদাস সিংহীর কাঁচা মাটির চালাঘরখানায় একটা বাতি জ্বলতো টিমটিম করে। দুপুরবেলা কাজকর্ম যা কিছু করবার করে নাও। তারপর সন্ধ্যে হবার আগেই চালাঘরের ঝাঁপখানা বন্ধ করতে হবে। তখন মালা নিয়ে জপ করতে বসবেন বৈষ্ণবদাস। জীবন তার প্রায় শেষ হতে চলেছে। পঞ্চাশ পেরিয়ে ষাটের ঘরে সবে যাত্রা! কিন্তু শহর ছেড়ে এই বনজঙ্গলের দেশে মানুষ আর কতদিন বাঁচবে! এখানটা পেরিয়ে সুতোনুটির ঘাটের কাছে পৌঁছোলেই গোরা-সাহেবদের কুঠীগুলো। লোক চলাচল যা-কিছু সব ওদিকে। পল্টনরা ওদিকে ঘোরাফেরা করে। ওদিকে যেতে সাহস হয় না বৈষ্ণব দাসের।

তখন নবাবেব সঙ্গে লড়াই শেষ হয়ে গিয়েছে।

হঠাৎ কী যে হলো। দেশের ক্ষেত খামারে সেবার চাষবাস হলো না মোটে। বৃষ্টি হলো না, টুকরো মেঘ যদিই বা হলো, তাও উড়ে গেল বাতাসে। নৌকোগুলো আসে আর ওদিকে থেকে দলে দলে উপোষী মানুষ এসে ভীড় করে এখানে। এই কলকাতায়।

মাঝিরা এসে বলে—চালান এবার বন্ধ করতে হবে সিংহীমশাই—

বৈষ্ণবদাস বলে—কেন ?

—কে চালান আনবে ? মাঠের ধান মাঠে পচছে, আমাদের ঘরে ঘরে ব্যামো, কারো ওঠবার ক্ষেমতা নেই—দেশ গাঁ সব মরে হেজে গেল—

সেই সময়ে দেশ থেকে বৈষ্ণবদাস বউ ছেলে মেয়েদের নিয়ে এসে তুললেন নিজের চালাঘরে। দেশে গাঁয়ে বাঘ ভাল্লুকের উপদ্রব শুরু হয়ে গিয়েছে। মানুষের আর লড়বার ক্ষমতা নেই, না খেতে পেয়ে চুরি ডাকাতি শুরু হয়ে গিয়েছে গাঁয়ে গাঁয়ে।

সেই হলো গিয়ে ছিয়াত্তুরে মন্বন্তর !

তা কারোর সর্বনাশ আর কারো পৌষমাস !

সেই থেকেই বৈষ্ণবদাস সিংহীমশাই-এর পৌষমাস শুরু হলো। একদিন খাস লাটসাহেবের বাড়ি থেকে ডাক পড়লো বৈষ্ণবদাসের। কলকাতার যত চালের আড়তদার সকলের ডাক পড়েছে সেখানে। বৈষ্ণদাস খালি পায়ে খালি গায়ে কুঁড়োজালিটা হাতে নিয়ে মালা জপতে জপতে হাজির হলেন গিয়ে লাটসাহেবের বাড়িতে। বিরাট বাড়ি। বাড়ির ভেতরের একটা ঘরে বসে আছে সব আড়তদার। খিদিরপুরের বাঙালী মহাজন জয়কৃষ্ণ সান্যাল। খয়রাপটির ভূদেব সরকার, কালীঘাটের কেনারাম মণ্ডল। আরো কত লোক। সকলকে বৈষ্ণবদাস চেনেন না। সকলের পেছনে বসে আছেন বৈষ্ণবদাস। ভয়ে তার বুক দুরদুর করছে, পা থরথর করে কাঁপছে। যদি কারবার-টারবার সব কেড়ে নিয়ে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয় !

তারপর লাটসাহেব এলেন। হেস্টিংস সাহেব। জাঁদরেল সাহেব বটে।

সাহেব বললেন—সাহেবদের ঘরে চাল নেই, মানুষ-জন খেতে পাচ্ছে না, আপনাদের সবাইকে চাল যোগাতে হবে—

বৈষ্ণবদাস ভয়ে তখন আরো শুকিয়ে উঠেছেন।

একে একে সকলকে ডাকলেন। সকলের নাম জিজ্ঞেস করলেন। ধাম জিজ্ঞেস করলেন। কতদিনের ব্যবসা। কতবড় কারবার। কত চাল আড়তে জমা আছে ! ইত্যাদি ইত্যাদি বহু প্রশ্ন।

দিদিমা বললে—তারপর এক সময়ে কর্তার ডাক পড়লো—

—কি নাম তোমার ?

—হুজুর, বৈষ্ণবদাস সিংহ।

—তোমার আড়তে কত চাল আছে ?

কর্তা মিথ্যে কথা বলতে পারতেন না। সোজাসুজি বললেন—হুজুর সতেরো হাজার মণ—

এতক্ষণে হাসি বেরোলো বড়লাট সাহেবের মুখ দিয়ে। আস্তে আস্তে লোকজনের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সোজা একেবারে পেছনের বেঞ্চিতে বৈষ্ণবদাসের কাছে এসে দাঁড়ালেন। হাতে হাত দিলেন। তারপর হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন মধ্যেখানে। পাশের চেয়ারে বসালেন কর্তাকে।

বললেন—তোমার সমস্ত চাল কোম্পানী কিনে নেবে—দু'টাকা দরে—

তা সেই হলো সূত্রপাত।

বড়লাট খুশি হয়ে একটা আপেল তুলে দিলেন কর্তার হাতে। বললেন—খাও তুমি—

কর্তা বললেন—আমি যে এখনও আহ্নিক করিনি হুজুর—

দিদিমা বলতে লাগল—তা সেদিন কর্তা ছিলেন বলে এই সমস্ত কলকাতার লোক খেয়ে পরে বাঁচলো রে। ছিয়াত্তুরের মন্বন্তর কেটে গেল। আর সিংহীবাবুদের জমি-জমা হলো এখানে। চারমহল বাড়ি উঠলো। জঙ্গল সাফ হলো। ওই উত্তরে হরিণ-বাড়ির জেল আর পুবে পোড়াবাজার আর দক্ষিণে কালিঘাট আর পশ্চিমে এই কেটোখুঁটির গঙ্গার ঘাট!—সমস্ত জায়গাটা জুড়ে সিংহীবাবুদের এলাকা। তখন আমিই বা কোথায়, তোর মামাই বা কোথায়। আর তোর মা-ই বা কোথায় আর তুই-ই বা তখন কোথায়—

রাত্রে শুয়ে শুয়ে গল্প শুনতে শুনতে কল্পনা করতাম আবার যেন মামা বড়লোক হয়েছে। এই ভাঙাবাড়ি সারিয়ে তুলেছে। এখানে আবার দোল রথ হচ্ছে। মিনি যেন মামারবাড়িতে পুজো দেখতে এসেছে। জরির পাড় লাগানো জামা পরেছে, দু'হাত জোড় করে ঠাকুরকে নমস্কার করছে। আমাকে বললে—তুইও নমস্কার কর—

তার দেখাদেখি আমিও নমস্কার করছি।

মিনি বললে—তুই ঠাকুরের কাছে কী চাইলি রে ?

বললাম—কিছু তো চাইনি, শুধু নমস্কার করলুম? তুই কী চাইলি?

মিনি বললে—আমি একটা পুতুল চেয়েছি। মস্ত বড় পুতুল—

—তোর তো পুতুল আছে!

মিনি বললে—ওটা তো ছোট্ট, ঠাকুরের কাছে আরো বড় পুতুল চেয়েছি—মস্ত বড়, আমি কোলে করে দুধ খাওয়াবো, মা যেমন করে বাচ্চুকে দুধ খাওয়ায়—তুইও চা ঠাকুরের কাছে, তোকেও দেবে ঠাকুর—মা বলেছে ঠাকুরের কাছে যা চাইবি তাই-ই দেবে ঠাকুর—চা না তুই—

বললাম—আমি কী চাইবো বল তো?

আমি যে-কী চাইবো বুঝতে পারতাম না। কি পেলে আমি খুশি হই? বাদামতলায় ভোলা কেবল বসে বসে ছিপ তৈরি করতো, কার্তিক তৈরি করতো গুলতি। সুরেশ্বরীদিদিই বা কী চেয়েছিল কে জানে! ঠাকুরের কাছে যে-যা চায় হয়তো তাই-ই সে পায়। সেই ছোট মেয়ে মিনি সেদিন হয়তো সত্যি কথাই বলেছিল। কী-ই বা আমি চেয়েছিলাম জীবনে আর কী-ই বা আমি পেয়েছি! কোথায় গেল বাদামতলার ভোলা! একদিন বাড়িভাড়া দিতে পারেনি ওর বাবা, তাই বাদামতলা ছেড়ে কোথায় কোন আবাদ অঞ্চলে ওদের চলে যেতে হয়েছিল একদিন। আর সুরেশ্বরদিদির বর বিপিনদা! বিপিনদাই কি সন্ন্যাসী হতে চেয়েছিল সত্যি সত্যি? তাহলে সুরেশ্বরীদিদিকে ছেড়ে যে চলে গিয়েছিল একদিন—সেই বিপিনদা আবার ফিরে এল কেন? কেন এসে আবার বিয়ে-থা করেছিল!

আর সেদিনের সেই স্বপ্নের কথা যে অমন করে সত্যি হবে তাই-ই কি আমি কোনোদিন ভাবতে পেরেছিলাম! তখন বড় হয়েছি একটু। আর একটু-একটু বুঝতে শিখেছি। মিনি তখন শাড়ি পরে। একদিন মামারবাড়ি গিয়েছি, হঠাৎ কানাই এসে বললে—এই, শুনেছিস!

কানাই ছিল আমাদের নতুন বন্ধু। কানাইদের ছিল খড়ের গুদাম।

আমি যেন কেমন ওর ভাবভঙ্গী দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। বললাম—কী রে?

কানাই আরো কাছে সরে এল। বললো—কাউকে বলিসনি—

—কাউকে বলবো না, কি বল ?

কানাই চুপিচুপি বললে—মিনির ছেলে হয়েছে—

ছেলে হয়েছে! যেন আকাশ ভেঙে পড়লো মাথায়। বললাম—কিন্তু মিনির তো বিয়ে হয়নি!

কানাই বললে—তা না হলেই বা—মিনিকে ওর বাবা খুব মেরেছে, মেরে হাড় গুড়িয়ে দিয়েছে একেবারে, জানিস—

—কিন্তু কেন ছেলে হলো রে!

কানাই বললে···

কিন্তু সে-কথা এখন থাক। পরের কথা পরেই বলবো। কথাটা শুনে পর্যন্ত সেদিন কেমন সারাদিন অন্যমনস্ক হয়ে কাটালাম। কিছুই ভালো লাগল না। সেই ছোট মিনির কথা আজো স্পষ্ট মনে পড়ে। হয়তো বয়েসই শুধু বাড়ে আমাদের, মন পড়ে থাকে সেই অতীতের ফেলে আসা দিনগুলোর মধ্যে! যখন না-ছোট না-বড়, উপলব্ধির আর অনুভূতির তন্ত্রীগুলো কাঁচা, একবার যা দেখি যা ভাবি যা শুনি, সবই তাতে দাগ ফেলে যায়। তারপর বড় বয়েসে কত কি ভেবেছি, কত কি দেখেছি, কত কি শুনেছি! কিন্তু সেগুলো সেদিনের মতো এমন চিরস্থায়ী দাগ ফেলেনি তো মনে!

মামা যখন অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিলে, যখন-তখন এসে দিদিমাকে গালিগালাজ আরম্ভ করলে—সেদিনের কথাও মনে আছে আমার। কি যেন নেশা করে এসেছিল মামা। টলছে টল্‌টল্‌ করে। দিদিমা ধরতে গেল মামাকে। মামা দু'পা পেছিয়ে এল ভয়ে। বললে—ছুঁয়ো না, মাইরি বলছি ছুঁয়ো না আমাকে—

দিদিমা বললে—কলতলায় পিছলে পড়ে গেলে তোর হাড়গোড় ভেঙে যাবে যে—

মামা বললে—তা যাক তুমি ছুঁয়ো না বলছি, নেশা কেটে যাবে আমার, আর তুমি আমার বাড়ি দিয়ে দাও আমাকে, আমি ভালোয় ভালোয় চলে যাচ্ছি—

—এ তোর বাড়ি ?

—আলবাৎ আমার বাড়ি, আমার বাবার বাড়ি আমি নেবো, তুমি কে ? তোমার বাবার বাড়ি পেয়েছ এটা ?

সে রাতটা আমি ডাক্তারবাবুর বাড়িতে শুয়েছিলাম। মা তাড়াতাড়ি আমাকে খিড়কির দরজা দিয়ে সোজা ডাক্তারবাবুর বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল। মিনিরা তখন খাচ্ছে।

কাকীমা বললে—ওমা, দিদি যে—কি হলো! এত রাত্তিরে?

মা কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে—আমার খোকনকে তোমাদের বাড়িতে একটা রাতের জন্যে রাখো ভাই—শুনছো তো দাদার চিৎকার, সামনে যা পাচ্ছে ভাঙছে ফেলছে—এখন একে সামনে পেলে খুন করে ফেলবে একেবারে—

মিনি আর আমি এক বিছানায় শুয়েছিলাম সেদিন। মিনির তখন একটা ছোট ভাই হয়েছে। বাচ্চুকে নিয়ে মিনির মা মাটিতে মেঝেয় বিছানা করে শোয়। আর বিছানার ওপর আমি। আমি আর মিনি। এক খাটে, এক মশারির ভেতরে।

মিনির মা নিচে থেকে বলছিল—হ্যাঁ রে, ভয় করবে না তো তোদের?

মিনি বলেছিল—বারে, আমরা তো দু'জন, ভয় করবে কেন?

—ভয় পেলে আমাকে ডাকিস্—আমি এখানে আছি।

চুপ করে শুয়ে ছিলাম। নতুন বাড়ি, নতুন বিছানা। মা-বাবা নেই কাছে। ও-বাড়ি থেকে মামার বিকট চিৎকার কানে আসছে। কেমন যেন অস্বস্তি লাগতে লাগল। সেই বৈষ্ণবদাস সিংহী—কবেকার কোন্ চালের আড়তদার, ছিয়াত্তুরের মন্বন্তরের সময় সমস্ত দেশটাকে বাঁচিয়েছিলেন। কত তাঁর নাম-ধাম, কত তাঁর প্রতিপত্তি ছিল। সেই বংশের কুলবধূ দিদিমা। ঘোমটা দিয়ে আলতা পরে একদিন গোয়ালটুলির ওই বাড়িতে পাল্কি করে এসে ঢুকেছিল। বছরের পর বছর কাক চিল চন্দ্র সূর্য কেউ-ই যে-দিদিমার মুখ একদিনের তরে দেখতে পায়নি, সেই দিদিমাই আজকে উঠোনে দাঁড়িয়ে মামার সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে চিৎকার করছে। গোয়ালটুলির পাঁচজনের বাড়ি থেকে সে-চিৎকার শোনাও যাচ্ছে। সবাই শুনতে পাচ্ছে সেই কান্না আর চিৎকার। এ-ও কি ঠাকুরের এক পরিহাস নয়! নির্মম নিষ্ঠুর পরিহাসই বটে। আর বাঘা-মামা? ওই পোড়াবাজার আর ওদিকে হরিণবাড়ির জেল আর এদিকে কালিঘাট পর্যন্ত যাদের এলাকা ছিল, সেই বংশের ছেলে বাড়ি থেকে ঝাড়লণ্ঠন, ঘটি, বাটি, থালা

বাসন চুরি করেই শুধু ক্ষান্ত হয়নি। শেষপর্যন্ত আজ বাড়িটাও বেচে দিতে চায়। চিৎকার করে মাকে বলে—তোমার বাবার বাড়ি না আমার বাবার বাড়ি ?

দিদিমা বলে—কারো বাড়ি নয়, এ আমার নিজের বাড়ি !

—মাইরি আর কি, তুমি বাড়ির জন্ম দিয়েছ, কেমন ?

—মুখ সামলে কথা বলিস বাঘা ! এ ভদ্দরলোকের পাড়া—

—ভদ্দরলোক ! সব ভদ্দরলোককে দেখা আছে বাঘার। বাঘা সিংঘী কাউকে পরোয়া করে না। নিজের বাড়ির ভেতর আমি যা খুশি করবো তাতে কা'র বাপের কি ! আমার খুশি হয়েছে আমি এই চৌবাচ্চায় ডুবে মরবো—এই ডুব দিলুম—দেখি কে কী করতে পারে ! এই ডুবলুম—

তারপরেই সত্যি সত্যি মামা এক-চৌবাচ্চা জলে ডুব দেয় আর সঙ্গে সঙ্গে ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে দিদিমা !

—ওরে ওঠ বাবা, তোরই বাড়ি। তুই-ই এ-বাড়ির মালিক। আমি মেয়েমানুষ, আমি বাড়ি নিয়ে কি করবো বল, ওঠ বাবা ওঠ, এই ঠাণ্ডায় জলে ডুবলে সর্দিকাশি হবে, ওঠ বাবা—

তখন সাধ্যি-সাধনা, খোশামোদ, কিছুর আর অন্ত থাকে না।

মামাও তখন পেয়ে বসে। বলে—আগে বলো বারো হাজার টাকা আমাকে দেবে ?

দিদিমা বলে—বারো হাজার টাকা কোথায় পাবো বল্ আমি ?

—তুই যদি এমন অবুঝ হোস তো কেমন করে চলে বল্ ?

—না আমার বারো হাজার টাকা চাই ! বলো দেবে, তবে উঠবো আমি জল থেকে !

—তা বারো হাজার টাকা আমি কোথায় পাবো তা তো বলবি !

ওদিকে এমনি চিৎকার কান্না আর অনুনয়-বিনয়ের পালা আর এদিকে ডাক্তারবাবুর বাড়ির ভেতরে মিনির বিছানায় শুয়ে আমার অনেক চিন্তা আসে। কীসের ভাবনা তা জানি না। মাথার ওপর বাবা, মা সব আছে। দিদিমা রয়েছে। কোথাও কোনও ভয় নেই। কিন্তু সমস্ত বুকটা যেন ফাঁকা ঠেকে। অন্ধকারে কে গায়ে হাত ঠেকালে—এই ! ঘুমিয়ে পড়লি ?

নরম একটা হাতের ছোঁয়া লাগে বুকে।

বললুম—না।

—ভয় করছে বুঝি?

বললাম—না তো—মা'র কথা ভাবছি।

শুয়ে শুয়ে সত্যি সত্যি মা'র কথাই ভাবছিলাম। শুধু কি মা'র কথা। দিদিমার কথাও ভাবছিলাম। ভাবছিলাম বাদামতলার কথাও। ভাবছিলাম সুরেশ্বরীদিদি আর তার অন্ধ শ্বশুরের কথা। মিনিদের ঘরের ভেতর মশারির ভেতর শুয়ে চোখের সামনে অনেক স্বপ্ন দেখছিলাম।

মিনি বললে—আরো কাছে সরে আয়, আয় সরে—

মিনির কাছে সরে গেলাম।

মিনি বললে—আমার গায়ে হাত দিয়ে থাক—বলে আমার হাতটা টেনে নিয়ে নিজের বুকে ঠেকিয়ে রাখলে।

বললে—তোর কোনও ভয় নেই, তুই ঘুমোলে তারপর আমি ঘুমোবো—

বললাম—মামাকে বলে দিবি না তো?

মিনি বললে—আমি কাউকে বলবো না—কানাইকেও বলবো না—

মিনির গায়ে তখনও আমার হাতটা ঠেকানো রয়েছে। তখন আর আমার ভয় করছে না। মনে হচ্ছে যেন সবাই আমার কাছে রয়েছে। যেন মা'র পাশেই শুয়ে আছি। বাদামতলার সেই বটুক মিত্তিরদের বাড়ির একখানা ঘরেরই খাটের ওপর।

মিনি আবার জিজ্ঞেস করলে—ঘুমোলি?

বললাম—না—

—শিগগির ঘুমো, নইলে আমি যে ঘুমোতে পারছি না।

বললাম—বা রে, ঘুম না এলে কী করবো—আমি তো ঘুমোতে চেষ্টা করছি—

মিনি বললে—তোকে ঘুম পাড়িয়ে দেবো? আয় কাছে সরে আয়, আরো কাছে—

আরো কাছে সরে গেলাম। একেবারে মিনির গা ঘেঁষে। মিনির লম্বা লম্বা চুলগুলো থেকে নারকোল তেলের গন্ধ আসতে লাগল। ঠিক মা'র মাথার চুলে এই রকম গন্ধ পেয়েছি কতবার।

মিনি বললে—এইবার ঘুমো—বলে আস্তে আস্তে আমার মাথায় হাত চাপড়াতে লাগল।

আস্তে আস্তে মিনি আমার মাথায় হাত চাপড়াচ্ছে আর আমার কেমন আস্তে আস্তে তন্দ্রা আসতে লাগল। ঘুমের সমুদ্রে ধীরে ধীরে তলিয়ে যেতে লাগলাম। মনে আছে সেবার যতদিন মিনিদের বাড়িতে শুয়েছিলাম রোজ মিনি আমার হাতটা নিয়ে নিজের গায়ে ঠেকিয়ে রাখতো আর আদর করে আমাকে ঘুম পাড়াতো। আমারও কেমন যেন নেশা লেগে গিয়েছিল। বড় ভালো লাগতো মিনির সঙ্গে শুতে।

সন্ধ্যে হলেই বলতাম—দিদিমা, এবার মিনিদের বাড়ি যাই?

সেদিন হঠাৎ ঘুমের ঘোরেই চিৎকার করে উঠেছি—উঃ—

যেন ভীষণ ব্যথা লেগেছে বুকের কাছে। মিনির হাতটা বুকে লাগতেই একটা ভীষণ যন্ত্রণায় আর একটু হলে প্রায় অজ্ঞান হয়ে যেতাম। মিনি বললে—কী হলো রে?

বললাম—ওখানে যে ব্যথা আমার—

—কীসের ব্যথা?

সন্ধ্যেবেলা সেদিনও বাবা তরি-তরকারি মিষ্টির পোঁটলা নিয়ে আপিস থেকে এসে হাজির।

দেখে বললেন—এ বিষফোড়া! সাবধান, যেন তেল-টেল না লাগে, একেবারে বিষিয়ে উঠবে তা হলে—

তেল লাগাইনি, কিন্তু তবু বিষিয়ে উঠলো! ব্যথায় বুকটা টন টন করে উঠলো। সারাদিন-রাত বাড়িতেই শুয়ে থাকি।

মিনি বলতো—দেখি, তোর ফোড়াটা দেখি?

বলতাম—না, তুই লাগিয়ে দিবি—

—না। হাত লাগাবো না, শুধু দেখবো—

বুকটা খুলে দিতেই মিনি বুকের কাছে মুখ নামিয়ে এনে ভালো করে ফোড়াটা দেখতো। জায়গাটা লাল হয়ে গিয়েছে। ঠিক দুটো পাঁজরার মধ্যেখানে। মিনির হাত দুটো জোরে ধরে থাকতাম আমি। যদি লাগিয়ে দেয় তা হলে আর বাঁচবো না।

মিনি বলতো—হাত ছাড়—আমি কিছুই করবো না—

—না, তুই লাগিয়ে দিবি।

—না, লাগাবো না, দেখ্—বলে আস্তে আস্তে ফোড়াটার

চারিদিকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। বড় আরাম হলো। সমস্ত শরীরটা যেন জুড়িয়ে যেতে লাগল।

মিনি বললে—রোজ আমি এসে তোর বুকে হাত বুলিয়ে দেবো এমনি করে, দেখবি ভালো হয়ে যাবে—কোনও ভয় নেই—

বাবা পরের দিন এসে বললেন—দেখি—ফোড়াটা দেখি—

ফোড়াটার চেহারা লাল। টনটনে ব্যথা হয়েছে সমস্ত বুকে। তবু মনে হতো আরো ব্যথা হোক, মিনি তা হলে হাত বুলিয়ে দেবে বুকে। মিনির হাতটা সরু, তাতে শুধু দু'গাছা সোনার চুড়ি। এসে বলতো—দেখি তোর ফোড়াটা—

সার্টটা খুলে বুকটা বার করে দিতাম।

বললাম—ফোড়াটা সেরে গেলে আবার তোদের বাড়িতে শুতে যাবো জানিস—

মিনি বললে—তাড়াতাড়ি ফোড়াটা সারিয়ে নে না, এত দেরি করছিস কেন ?

মনে আছে যে-ক'দিন ফোড়াটা হয়েছিল রোজ বিকেলে সকালে সব সময়ে মিনি আসতো আমাদের বাড়ি। কাকীমাও এল একদিন।

বললে—খোকন কেমন আছে দিদি ?

মা বললে—ওই দেখো না ভাই, ছেলে কি এক ফোড়া বাধিয়ে বসেছে, ফাটেও না, যন্ত্রণাও যায় না।

—একটু উনুনের মাটি বেশ পাতলা করে নেপে দাও না, দু'দিনে ফেটে যাবে।

দিদিমা চান করে আসবার পথে শনি-ঠাকুরের ফুল নিয়ে এসে মাথায় ঠেকিয়ে দিলে। ভালোয় ভালোয় ছেলে যদি সেরে ওঠে ঠাকুরের কৃপায়! এক মামা তো দিদিমার অশেষ যন্ত্রণার কারণ হয়েছে, এক নাতিও যদি বেঁচে থাকে তো দিদিমার অনেক শান্তি। শুয়ে শুয়ে বেশ লাগতো কিন্তু আমার। যন্ত্রণা হতো সমস্তক্ষণ। কিন্তু মিনি এলেই বলতাম—এই, আমার বুকে হাত বুলিয়ে দিবি না ?

মিনি কাছে এসে বুকে হাত বুলিতে দিতো।

আমি বলতাম—আজ তুই বেড়াতে গেলি না ?

মিনি বলতো—তুই সেরে ওঠ, তোর সঙ্গে আবার বেড়াতে যাবো—

বলতাম—জলটুঙিতে গিয়েছিলি আর ?

মিনি বললে—না—

—আর হরিণবাড়ির জেলের দিকে ?

—না।

—সেই পোড়াবাজারের মাঠে ?

মিনি বললে—না রে না, তুই না গেলে ওদিকে আমি আর যাবোই না—

মনে আছে পরে যখন হরিণবাড়ির জেলের মাঠে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল তৈরি হচ্ছিল, তখন একদিন ট্রাম থেকে নেমে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম। বিরাট বিরাট শ্বেতপাথর ছেনি দিয়ে কাটছে মিস্ত্রিরা। মাঠ-ঘাট সাফ করে কত মিস্ত্রি যে গাঁথনি করতে কাজে নেমেছে তার আর ইয়ত্তা নেই। দুপুরবেলা কাজকর্ম সব ভুলে গিয়ে একটা পাথরের ওপর বসে পড়েছিলাম মনে আছে। এখন আর ওখান থেকে পোড়াবাজারের মাঠটা দেখা যায় না। ওই মাঠ পার হয়ে কতদিন এইখানে এসে বসেছি আমরা। এই ঘাসের ওপর আমাদের ছিল দু'জনের ছোটবেলার জগৎ। রঘু আসতো মিনির সঙ্গে। বিকেলবেলা মিনিকে সঙ্গে নিয়ে বেড়ানোই ছিল রঘুর কাজ। আর আমি আসতুম তার সঙ্গে। এক-একদিন এক-এক দিকে। এক-একদিন হরিশ পার্কে। কিন্তু সেখানে বড় ভিড় থাকতো। মনে হতো পার্কের ছেলে-মেয়ের ভিড়ের মধ্যে মিনি যেন হারিয়ে যাবে।

কিন্তু জলটুঙির জলের ধারে, পোড়াবাজারের মাঠে কিম্বা গড়ের মাঠের ফাঁকার মধ্যে মিনি যেন ছিল আমার নিজস্ব।

বেড়াতে বেরোবার সময় মিনি বলতো—আজ কোনদিকে যাবি রে ?

বলতাম—জলটুঙিতে চল যাই—

মনে পড়তো জলটুঙির সেই রেলিঙ-ঘেরা বাগান। তখন বিকেলের আলো নিবে আসছে একটু একটু করে। বেড়াচ্ছি দু'জনে হাত ধরাধরি করে। মিনির দু'হাতে দু'গাছা সরু চুড়ি, আর পরনে পাতলা সিল্কের ফ্রক। আর আমি পরেছি বাদাম-তলার হাট থেকে কিনে দেওয়া সবুজ হাফপ্যান্ট আর সার্ট। বাগানের মধ্যেখানে পুকুরে টইটম্বুর জল। তারই মাঝখানে

একটা দ্বীপের মতন জায়গা। মিনি বলেছিল—তোদের বাদাম-তলায় তো জলটুঙি নেই—

তা নেই, তাই জন্যে তো এত ভালো লাগে এখানে বেড়াতে।

পেছনে অনেক দূরে দূরে রঘু আসতো আর আমরা দু'জন পা ঘষতে ঘষতে আগে আগে চলতাম। তারপর কখন দু'জনে এসেছি জলের ধারে মনে নেই কারো। বিকেলের আলোর ছায়া পড়েছে জলে। অল্প অল্প বাতাসে ছোট ছোট ঢেউ উঠছে। দুটি শিশু জলের ধারে এসে দাঁড়ালো সেদিন। ইতিহাসের এক অমোঘ নিয়মে বুঝি কেউ বেঁধেছিল তাদের।

মিনি নিচু হয়ে জলের দিকে চেয়ে বললে—জলের ভেতর অনেক মাছ আছে, না রে?

মাছ! জলের একটু তলাতেই শুধু মাটি। আর সেই মাটির ওপর শ্যাওলা গজিয়েছে। জলের ঢেউ লেগে শ্যাওলাগুলো হেলছে দুলছে। ছোট ছোট চারা মাছ কয়েকটা একেবারে ডাঙার ধারে এসে ঘুরে ঘুরে চলে যাচ্ছে। হলদে-হলদে কালো-কালো সব চেহারা। সেখানে দাঁড়িয়ে সেই ছোট বেলাতেই মনে হয়েছিল গোয়ালটুলি বাদামতলার চেয়ে সত্যিই অনেক ভালো। গোয়ালটুলিতে জলটুঙি আছে। আর মিনি আছে আর আমি আছি।

হঠাৎ মিনি বললে—ওই দেখ আমি—

অদ্ভুত আগ্রহে মিনি নিচে জলের ওপর নিজের ছায়া দেখে আনন্দে লাফিয়ে উঠেছে।

—ওই দেখ আমি—

আমিও চেয়ে চেয়ে দেখলাম। জল দুলছে, আর সেই দোলা লেগে মিনির মুখখানার ছায়াও দুলছে। তারপর হঠাৎ মিনি আবার বললে—ওই দেখ, তুই—

আমিও দেখলাম—আমি আর মিনি দু'জনের মুখের দুটো ছায়া জলের ওপর ধীরে ধীরে নির্ভয়ে দুলছে। পৃথিবীর যে-যেখানে থাক, তাতে কিছু আসে যায় না। বাদামতলার ভোলার বোন খুন্তিদি যদি আমায় দেখতে না পারে তাতেও কোনও ক্ষতি নেই আজ। ভোলাদের আবাদে অনেক টাকা কড়ি যদি থাকেই তো থাকুক, আমার কিছু আর তাতে আসে যায় না। বাঘা-মামা যদি

আমার পকেট থেকে পয়সা কেড়ে নেয় তাতেও কিছু আর ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। আমার আর কি চাই! আমার সব পাওয়া হয়ে গিয়েছে। সেই মুহূর্তে মনে হলো সকলের যেন সব অপরাধের ক্ষমা করতে পারি। আমার লাট্টু লেত্তি, আমার ঘুড়ি লাটাই, আমার নিজের বলতে যা কিছু তা-ও আমি যেন যে-চাইবে তাকে আজ দিয়ে দিতে পারি। আমার সব আছে। এই জলটুঙির জল আছে, জলের পাতলা ঢেউ আছে। আর সেই জলের ধারে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আমি আছি আর মিনি আছে!

মিনি হঠাৎ বললে—এই, তুই আমার কাছে সরে আয়—আরো কাছে—

আমি মিনির আরো কাছে সরে গেলাম। দেখলাম জলের ওপরে আমার মুখের ছায়াটাও মিনির মুখের ছায়ার কাছে সরে গিয়েছে। তুটো মুখই আমাদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে।

মিনি বললে—আরো কাছে সরে আয়—

আমার কাঁধে হাত দিয়ে মিনি আমাকে নিজের দিকে আরো টানলে। আমার মুখের ছায়াটা আরো সরে গেল মিনির মুখের ছায়ার দিকে।

—আরো, আরো—

শেষে তু'জনের গায়ে ঠেকাঠেকি হয়ে গেল। তু'জনে গায়ে গা লাগিয়ে ঠেকাঠেকি করে দাঁড়িয়েছি। তু'জনেই খিল্‌খিল্ করে হাসছি। বেশ মজা লাগছে। মিনি তখনও নিচের দিকে চেয়ে নিজের দিকে দেখছে। বললে—আমার গালে তোর গাল লাগা—

লাগালাম। মিনির নরম গালে আমার গালটা লাগিয়ে দিলাম। আমাদের জোড়-লাগানো তুটো ছায়া হেলতে তুলতে লাগল জলের ওপর। আর সেই বিকেল বেলা জলটুঙির জলের ধারে পৃথিবীর মানুষের চিরকালের চিরন্তন তুটি শিশু তাদের নিজেদের ভালোবেসে ফেললো। মাথার ওপর তাদের আকাশ নেই, পায়ের তলায় তাদের মাটি নেই, তাদের বয়েস নেই, তাদের ভাবনা নেই, সমস্যা নেই—শুধু তুটো মুখ। তুটো মুখ আর তুটো মন আর···আর কিছু নেই!

কিন্তু ওই একটি মুহূর্তই শুধু। তারপরেই হঠাৎ পাশের কৃষ্ণচূড়া গাছ থেকে একটা ঝরা ফুল বাতাসে উড়ে এল। আর

পড়লো ঠিক ছায়াহুটোর ওপর। সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে গেল মুখ হুটো, ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল, ভেঙে চেপ্টে থেঁত্‌লে গেল।

রঘু দূর থেকে বললে—দিদিমণি সন্ধ্যে হয়ে গেল, বাড়ি চলো—

বাড়ি আসতে আসতে বললাম—কালকেও এখানে আসবো ভাই, কী বলিস ?

মিনি বললে—আমি আর তুই, আর কাউকে বলিসনি—

বললাম—আমরা হু'জনে এই খেলাটা খেলবো—বেশ মজা হয়, না ?

বাদামতলায় একদিন হুপুরবেলা হৈ হৈ পড়ে গেল খুব। ভোলার দিদির অসুখ আরও বেড়েছে। ভুগে ভুগে তখন হাড়সার হয়ে গিয়েছে। কেউ সারাতে পারছে না। ভোলার বাবা এক সাধুবাবাকে এনে হাজির করেছে। ভোলার বাবার এক হাতে হুঁকো আর এক হাতে ছাতা। হু'পায়ে চটি। ঘোড়াটার পিঠের ওপর মানকচু, কুমড়ো আর হু'পাশে মস্ত হুই পোঁটলা। আর ভোলার বাবার পেছনে ঠিক সেই রকম আর একটা ঘোড়া। সেই ঘোড়াটার উপর গেরুয়া পরা দাড়ি-গোঁফওলা বিরাট এক সাধু। আমরা পাড়ার ছেলেরা ঘোড়ার পিছনে পিছনে চলতে লাগলাম। তুষপুকুরের পাশ ঘেঁষে এক ফালি রাস্তা। ঘোড়া হুটো গিয়ে থামলো বেলগাছের তলায়। আর ভোলার বাবা আদর-আপ্যায়ন করে সাধুজীকে নামিয়ে নিলেন। বললেন, —আসুন সাধুবাবা—ভেতরে চলুন—

সাধুবাবার বিরাট জটা। আমরা ছেলেরা সবাই ভিড় করে দেখছি। সাধুবাবা মৃহু মৃহু হাসছেন। ভেতরের ঘরে গিয়ে ঢুকলো সবাই। ভোলার দিদি বিছানার উপর শুয়ে ছিল। ভুগে ভুগে একেবারে হাড়সার হয়ে গিয়েছে তখন। সাধুবাবা পাশে গিয়ে বসলেন। ভোলার দিদির হাতটা টেনে নিলেন। বললেন,—কিছু ভয় নেই—সব ভালো করে দেবো—কিছু ভয় নেই—

আর সত্যিই, সেই ভোলার দিদি শেষ পর্যন্ত ভালো হলো অদ্ভুতভাবে। বাদামতলার লোক অবাক হয়ে গেল সাধুবাবার

ক্ষমতা দেখে! তারপর এল মাদুলি, তাগা, হাত দেখার ব্যাপার। সে এক এলাহি কাণ্ড!

সুরেশ্বরীদিদির শ্বশুর বললেন,—বিপিনও বোধহয় সাধু হয়ে গিয়েছে জানো বৌমা—

সুরেশ্বরীদিদি ভাঙা সিমেন্টের রোয়াকের ওপর পা ছড়িয়ে দিয়ে সেলাই করছিল।

শ্বশুর হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন,—অ-বৌমা, কোথায় গেলে, অ-বৌমা—

সুরেশ্বরীদিদি পাশ থেকেই বললে,—এই তো আমি বাবা, কোথাও যাইনি তো—

—ও, তুমি আছ, আমি ভাবলাম···

বুড়ো ভাবছিল বৌমা বোধহয় কোথাও চলে গিয়েছে। বললে, —কী সেলাই করছ গো বৌমা!

সুরেশ্বরীদিদি বললে,—এই আপনার ধুতিখানা—

বুড়োর আবার অতীত কথা মনে পড়ে যেত। বলতেন, —জানো বৌমা, তোমার শাশুড়ী খুব সেলাই করতে পারতেন, রান্না-বান্না হলেই সেলাই নিয়ে বসতেন। খাটবার ক্ষমতাও ছিল। তিনি থাকলে তোমার আর এই খাটনি হতো না এত—

হঠাৎ যেন কী কথা তাঁর মনে পড়ে গিয়েছে,—হ্যাঁ বৌমা, এবারে ট্যাক্স নিতে এল না?

সুরেশ্বরীদিদি বলতো,—নিয়ে গিয়েছেন তো যতীনবাবু!

—কখন নিয়ে গেল! আমি টের পেলুম না তো?

যতীনবাবুকে আমিও দেখেছি। ছোকরা-মতন চেহারা। কিন্তু একটু মোটাসোটা। চেহারাখানা এখনও স্পষ্ট মনে করতে পারি। বেশ পরিস্কার দাড়ি-গোঁফ কামানো। একটা পুরানো সাইকেলের হ্যাণ্ডেলের উপর একটা পেটফোলা ব্যাগ ঝুলতো। যতীনবাবু এসে ডাকতেন না কাউকে। বাড়ির সদর-দরজার সামনে এসে সাইকেলের ঘণ্টিটা বাজাতেন শুধু। ঠিং-ঠিং-ঠিং!

বাবা বলতো—ওই বোধহয় যতীনবাবু এসেছে, দেখো তো খোকন।

গিয়ে দেখতাম সত্যিই তাই।

যতীনবাবু বলতেন,—খোকা তোমার বাবাকে বলো তো তোমাদের ট্যাক্সটা দিতে—

বাবা বলতো,—কালকে আসতে বলে দে।

লোকে জানতো যতীনবাবুর অনেক টাকা। ষাট টাকা মাইনে পেতেন যতীনবাবু আপিস থেকে, কিন্তু কামাই ছিল অনেক। ট্যাক্সের টাকা আপিসে জমা না দিয়ে সুদে খাটাতেন। সেই সুদের সুদ চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে বেড়ে অনেক টাকা জমে যেত। তাই দশবার ফিরতে হলেও বেজার ছিল না। একের পর এক, সব বাড়িতে ট্যাক্স আদায় করে যতীনবাবু আপিস যেতেন বিকেলের দিকে। তাই অনেক দিন দেখেছি সুরেশ্বরীদিদির বাড়ির সামনে যতীনবাবু দাঁড়িয়ে আছেন।

আমাকে বলতেন,—খোকা, ভেতরে গিয়ে বলো তো ট্যাক্সের টাকা চাইতে এসেছে যতীনবাবু—

সুরেশ্বরীদিদির শ্বশুরের সতেরো টাকা পেনশনের হিসেব যেমন আলাদা, তিন মাস অন্তর ট্যাক্সের টাকাটাও তেমনি আলাদা রাখা থাকতো।

শ্বশুর বলতো,—বৌমা, ট্যাক্সের টাকা নিতে আসবে এ-মাসে, মনে থাকে যেন—

সুরেশ্বরীদিদি বলতো,—টাকাটা আলাদা করে রেখে দিয়েছি বাবা।

মাত্র সাত টাকা তিনমাস অন্তর! কিন্তু সেই সাতটি টাকা যেন আলাদা করা থাকে। যেন যতীনবাবুকে তাগাদা না করতে হয়।

ঝাঁ ঝাঁ করছে রদ্দুর। বাদামতলার রাস্তায় তখন জনমানব নেই। আমি তখন হয়তো বাড়ি থেকে বেরিয়ে তুষপুকুরের পাশ দিয়ে ভোলাদের বাড়ির বেলগাছটার তলায় গিয়ে দাঁড়িয়েছি, হঠাৎ দেখি যতীনবাবু সাইকেলের ওপর পেটফোলা ব্যাগটা ঝুলিয়ে সুরেশ্বরীদিদির বাড়ির সামনে নেমে দাঁড়িয়ে ঠিং-ঠিং-ঠিং করে সাইকেলের ঘণ্টা বাজাচ্ছেন।

আমাকে দেখেই যতীনবাবু বললেন,—খোকা ভেতরে গিয়ে বলো তো ট্যাক্সের টাকাটা দিতে—

সুরেশ্বরীদিদি তখন হয়তো খাওয়া-দাওয়া সেরে উঠেছে

সবে। ট্যাক্সের কথা শুনেই কুলুঙ্গি থেকে একটা কৌটা বার করে বললে,—এই টাকাটা দিয়ে আয় তো, আমি আর বেরোবো না—

টাকাটা দেবার পর যতীনবাবু বললেন,—খোকা এক গ্লাস জল আনতে পারো ভেতর থেকে ?

আবার আমি ভেতরে যেতাম। সুরেশ্বরীদিদি একটা কাঁসার গেলাসে ঠাণ্ডা কুঁজোর জল ঢেলে আমার হাতে দিতো। জলটা খেয়ে যতীনবাবু আবার সাইকেলে উঠে চলে যেত। মনে হতো জলটা খেয়ে যতীনবাবু যেন ভারী তৃপ্তি পেলেন।

বাদামতলার জীবনযাত্রার মধ্যে কোথায় কখন কী ঘটতো তা আমি আর ভোলা সব জানতে পারতাম। ফটিক কাকার বাড়িতে রোজ সকালবেলা কাবলিওলা এসে কেন দরজার গোড়ায় ধরনা দেয়, কোন্ মাসে খড়ের নৌকোগুলো এসে গঙ্গার ধারে লাগে আর বাদামতলার হাটে সস্তায় খড় বিক্রি করে, সব দেখতে পেতাম। দেখতে পেতাম বাদামতলার পুকুরের জলে হাঁসগুলো ভাসতে ভাসতে হঠাৎ ডুবে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যেত, রাত ন-টার সময় কালীঘাটের স্টেশনের দিক থেকে প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ইঞ্জিনের হুইসল-এর শব্দ শোনা যেত, আর পেল্লাদ চৌধুরীদের দরোয়ান চৌবেজীর রাত এগারটা পর্যন্ত তুলসীদাসী রামচরিত-মানস পড়ার আওয়াজ আসতো কানে। আর সুরেশ্বরীদিদির শ্বশুর রাত্তিরবেলা হঠাৎ উঠে জিজ্ঞেস করতো,—বৌমা, ও কীসের শব্দ গো ? বৌমা—?

সুরেশ্বরীদিদি পাশের ঘর থেকে বলতো,—কই ? শব্দ তো শুনিনি কিছু !

শ্বশুর বলতো,—পেনশনের টাকাটা ভালো করে রেখেছ তো ? দেখো—

সুরেশ্বরীদিদি বলতো,—হ্যাঁ।

—আর ট্যাক্সের টাকাটা ?

—ট্যাক্সের টাকা তো নিয়ে গিয়েছে !

বুড়ো শ্বশুরের যেন অবাক লাগতো।

—নিয়ে গিয়েছে ? কবে নিয়ে গেল ? আমি তো টের পেলুম না ?

সুরেশ্বরীদিদি বলতো,—আপনি তখন ঘুমুচ্ছিলেন, তাই আর ডাকিনি আপনাকে।

—গুনে দিয়েছ তো ? বেশি দাওনি ? রসিদ দিয়েছে ?

ঘুম এমনিতেই সুরেশ্বরীদিদির হয় না। সেই যেদিন থেকে বিপিনদা চলে গিয়েছিল, সেই দিন থেকেই হয় না। সোজা সুস্থ মানুষটা, ঝগড়াও করেনি, রাগারাগিও করেনি। সকালবেলা যেমন ইস্কুলের আগে ভাত বেড়ে দেয় তেমনিই বেড়ে দিয়েছিল। পান-দোক্তা খাবার বালাই ছিল না, সুতরাং যেমন যায় মানুষটা তেমনিই বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিল। কোটটা গায়ে দিয়ে জুতোটা পায়ে দিয়ে চলে গিয়েছিল। পকেটে ছ-আনা তিন পয়সা ছিল। কোথায়ই বা গেল, কেনই বা গেল, তা ভেবে ভেবে কেউ-ই কূল পায়নি।

শ্বশুর বলতো,—কুলের অম্বলে আজকে আখের গুড় দিয়েছিলে বুঝি বৌমা ?

সুরেশ্বরীদিদি বলতো,—কেন ? খেতে খারাপ লেগেছে আপনার ?

শ্বশুর বলতো,—আমার আর কিছু খারাপ লাগে না বৌমা, তোমার শাশুড়ী আমায় ভালো-মন্দ সব খাইয়ে দিয়ে গিয়েছেন। তোমার শাশুড়ী যতদিন ছিলেন, আমার চোখও ভালো ছিল। আমি বাজার করে এনে দিতাম, আর তিনি প্রাণভরে রাঁধতেন।

তারপর খানিক থেমে বলতেন,—হ্যাঁ বৌমা, ফাল্গুন মাস শেষ হতে চললো, এখনও এঁচোড় ওঠেনি বাজারে ?

সুরেশ্বরীদিদি বলতো—আমি এঁচোড় আনতে বলবো'খন কাশীর মাকে—

শ্বশুর লাফিয়ে উঠতো। বলতো,—না না বৌমা, আমার জন্যে বলছি না, এঁচোড়ে আমার অরুচি ধরে গিয়েছে, সে-রকম এঁচোড় তোমরা দেখোনি। বোঁটা দিয়ে আঠা ঝরে পড়তো টপ্‌টপ্‌ করে। তাই ডুমো ডুমো করে কুটে বেশ গরমমশলা দিয়ে তোমার শাশুড়ী রাঁধতেন, সমস্ত পাড়াময় গন্ধে একেবারে ভুরভুর করতো। আজকালকার চালানি এঁচোড়, ঘাস খাওয়াও যা ও খাওয়াও তাই—

আমি এক-একদিন বলতাম,—সারাদিন তোমার এই বুড়ো শ্বশুরের সঙ্গে বক্ বক্ করতে ভালো লাগে সুরেশ্বরীদিদি ?

সুরেশ্বরীদিদি বলতো,—ছিঃ, শ্বশুর হলো গুরুজন, ও-কথা ভাবাও পাপ, জানিস—ও-কথা আর কখনও বলিসনি মুখে—

বলতাম,—কিন্তু এত নোলা কেন তোমার শ্বশুরের ? জানে না সতেরো টাকা পেনশন থেকে এত আসে কী করে ?

সুরেশ্বরীদিদি এ-কথা শুনে সত্যিই রেগে যেত। বলতো,—উনি আর ক'দ্দিন বল্, ওঁর কি মাথার ঠিক আছে ? বুড়ো হলে সবাই ওই রকম হয়ে যায় ! একে চোখে দেখতে পান না, কাজ করবার ক্ষমতা নেই—তাই, আমি পাশে আছি, আমার সঙ্গেই কথা বলে আরাম পান।

বলতাম,—তোমারও তো শরীর ? তোমারও তো সাধ-আহ্লাদ আছে ?

সুরেশ্বরীদিদি বলতো,—আমি তো এখন অনেকদিন বাঁচবো, কিন্তু ওই বুড়ো মানুষের কী কষ্টটা বল তো। ছেলে থাকলে তবু কথা ছিল। তা-ও তো নেই ওঁর। এই বয়েসে আমি যদি না দেখি তো কে দেখবে ? তুই যখন নিজে বুড়ো হবি, তখন বুঝবি, উনি যে বেঁচে আছেন এই যথেষ্ট—

তা এমনি যখন অবস্থা, তখন ঠিক সেই সময়েই ভোলাদের বাড়িতে সাধুবাবা এল। ভোলার দিদির অসুখ সারবার পর থেকে আরও লোকে লোকারণ্য ! মা, জ্যাঠাইমারা একদিন গিয়ে হাত দেখিয়ে এল। ফটিক কাকার পোয়াতি মেয়ে বাপের বাড়ি এসেছিল। সাধুবাবা হাত দেখে বলে দিলে,—এ মেয়ের পেটে যে ছেলে হবে, তার দু'হাতে ছ'টা করে আঙুল থাকবে।

কার্তিকের মা, সুজিতের কাকীমা সবাই গিয়ে ভিড় করলে ভোলাদের বাড়িতে। কাউকে মাদুলি, কাউকে তাগা, কাউকে শেকড়। কেউ বাদ গেল না। ফটিক কাকার বাতের ওষুধ দিলে সাধুবাবা। সাধুবাবার চেহারাটাও দেখবার মতো।

ভোলা বললে,—সাধুবাবা কিচ্ছু খায় না, জানিস—কিচ্ছু খায় না—

অবাক হয়ে গেলাম। বললাম,—তবে কী খেয়ে বাঁচে ?

ভোলা বললে,—সাধুবাবা তো মানুষ নয়, ঠাকুর।

বললাম,—ঠাকুররাও তো খায়, নৈবিদ্যি খায়।

ভোলা বললে,—সাধুবাবাও শুধু বেলপাতা খায়!

বিশ্বাস হলো না, বললাম,—শুধু বেলপাতা?

ভোলা বললে,—হ্যাঁ, সকালবেলা দুটো, আর রাত্তিরবেলা দুটো। সারা দিন-রাত্তিরে আর কিছু খায় না।

আরও অবাক লাগল। সাধুবাবার চেহারা দেখলেও কেমন যেন ভক্তিতে আপনিই মাথা নুয়ে আসে। আগাগোড়া গেরুয়া বসন। যে যাচ্ছে কাছে, তাকেই আশীর্বাদ করছে। কোনও দিকে লোভ নেই, কারও দিকে বিশেষ পক্ষপাত নেই। সদাশিব অমায়িক সাধু।

ভোলা বললে,—আমাদের আবাদের সাধুবাবা কি না, তাই খুব ভালো। কলকাতার সাধুগুলো ফাঁকিবাজ—

ভোলাদের আবাদ সম্বন্ধে আমার আরও শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। ভোলাদের আবাদে কত সোনার টাকা আছে, রুপোর টাকা আছে, ভোলাদের আবাদে কত ভালো-ভালো সাধুবাবা আছে।

সুরেশ্বরীদিদি প্রথমে যেতে চায়নি। সুরেশ্বরীদিদি এমনিতে কোথাও যেত না। সারাদিন কেবল সংসারের টানা-পোড়েন নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতো, তার যাবার সময়ও ছিল না। আর শুধু সময়ের অভাবের জন্যেও নয়। কার কাছেই বা যাবে! কোথাই বা যাবে! কোথাও যাবার মতো একখানা ভালো কাপড়ও দেখিনি সুরেশ্বরীদিদির। শেষকালে আমিই একদিন রাজী করালাম। তখন ভোলার দিদি ভালো হয়ে উঠেছে। সেই দিনই চলে যাবে সাধুবাবা।

সুরেশ্বরীদিদির শ্বশুর বললে,—তা যাও না বৌমা, আমার চোখ থাকলে আমি নিজেই যেতাম।

সুরেশ্বরীদিদি বললে,—না, গিয়ে কাজ নেই, আপনাকে একলা ফেলে আমি কোথাও যাব না, আপনার কষ্ট হবে।

শ্বশুর বললে,—আমার কষ্ট মলে যাবে বৌমা, আমার কষ্ট আর গিয়েছে। যেদিন তোমার শাশুড়ী গিয়েছেন, বিপিন ঘর ছেড়েছে, সেদিন থেকেই আমার সুখ চলে গিয়েছে। তুমি যাও বৌমা। বলছে তো খুব নাকি ভালো সাধু। আমাদের আপিসের রবার্টসন সাহেব খুব সাধু-টাধু মানতো।

তবু সুরেশ্বরীদিদি যায়নি।

বললাম,—তোমার শ্বশুর তো বলছে, চলো না হাতটা দেখিয়ে আসবে।

সুরেশ্বরীদিদি বললে,—না আমার যাওয়া চলে না, আমি এক মিনিট আড়ালে গেলে উনি বৌমা-বৌমা করে অস্থির হবেন, ওঁর কষ্ট হবে—

মনে আছে সুরেশ্বরীদিদির শ্বশুর বলেছিল,—তুমি গিয়ে একবার জিজ্ঞেস কর না বৌমা, বিপিন আমার ফিরবে কি না—

কিন্তু সুরেশ্বরীদিদি সে-সব কিছুই জিজ্ঞেস করেনি সেদিন।

সাধুবাবা যেমন করে আর সকলের হাত দেখেছিল, সুরেশ্বরী-দিদির হাতও সেই রকমভাবেই দেখেছে। বাড়ি ফিরে আসার পর অন্ধ শ্বশুর জিজ্ঞেস করেছিল,—কী বললে বৌমা? বললে বিপিন কবে ফিরবে?

সুরেশ্বরীদিদি বলেছিল,—না।

তারপর একটু থেমে বলেছিল,—আপনার পাঁচনটা দেবো? খাবেন?

শ্বশুর তবু জিজ্ঞেস করলে,—তবু কী কী বললে শুনি?

মনে আছে সুরেশ্বরীদিদির সমস্ত মুখখানাই কেমন যেন রাঙা হয়ে উঠেছিল সাধুবাবার কথাটা শুনে। ঘোমটার আড়ালে সুরেশ্বরীদিদি যেন একটু কেঁপে উঠেছিল। ভয়ে কেঁপেছিল না আনন্দে কেঁপেছিল, না বিস্ময়ে কেঁপেছিল, তা বলতে পারবো না। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল, সাধুবাবার কথা শুনে সুরেশ্বরী-দিদি যেন হাতটা টেনে নিতে চেয়েছিল। এতখানি লজ্জা, এতখানি বিস্ময় যেন ফুলশয্যার রাত্রেও অনুভব করেনি সুরেশ্বরীদিদি! তখন আমার সেই বয়েসে ফুলশয্যার কল্পনা করা অসম্ভব হলেও, এখনকার মন দিয়ে বুঝতে পারি, সুরেশ্বরীদিদির সমস্ত শরীর আর সমস্ত মন জুড়ে যেন এক আবেগ এক রোমাঞ্চ ছড়িয়ে গিয়েছিল। নইলে ভোলাদের বাড়ি থেকে ফেরবার পথে সারাটা পথ কোনও কথা বলেনি কেন! কেন চুপ করে মাথায় ঘোমটা দিয়ে আমার পেছনে পেছনে চলে এসেছিল সেদিন।

একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম সেদিন,—তুমি কথা বলছ না যে? বিশ্বাস হয়নি বুঝি?

সুরেশ্বরীদিদি বলেছিল—তুই আগে-আগে চল; কেউ দেখে ফেলবে।

কোনও রকমে মাথায় ঘোমটা টেনে সেদিন নিজের বাড়ির ভেতরে ঢুকে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়েছিল সুরেশ্বরীদিদি !

তারপরেও অনেকবার কথাটা তুলেছি সুরেশ্বরীদিদির কাছে। কখনও স্পষ্ট জবাব পাইনি।

বুড়ো শ্বশুর বললে,—আমাদের রবার্টসন সাহেবের ভারী বিশ্বাস ছিল, জানো বৌমা, সাধু দেখলেই টাকা দিতো—

তারপর জিজ্ঞেস করলে,—বিপিনের কথা তুমি কিছু জিজ্ঞেস করোনি বৌমা ?

সুরেশ্বরীদিদি বললে,—এই পাঁচনটা খেয়ে নিন বাবা—

বুড়ো বললে,—জিজ্ঞেস করলেই পারতে ! এক-একজন সাধু থাকে, তারা ত্রিকালজ্ঞ, মুখ দেখেই সব বলতে পারে, কিছু জিজ্ঞেস করতে হয় না।

তারপর পাঁচনটা গিলে ফেলেই একটা লবঙ্গ চুষতে চুষতে বললে,—ফিরলে নিশ্চই বলতো। সে আর ফিরছে ! এত বছর হয়ে গেল—

তারপর যেন আপন মনেই বলতে থাকে,—বেঁচে আছে কি না কে জানে ! একটা আক্কেল গম্যি কিছু নেই। দেখো না, দুটো মানুষ, ওই আমার সতেরো টাকার পেনশনটা ছিল বলেই তো ? না থাকলে কোথায় যেতাম বলো তো !

তারপর আবার একটু থেমে বলতো,—বৌমা ! শুনছ ?

সুরেশ্বরীদিদি পাশেই পাঁচনের বাটিটা ধুচ্ছিল। বললে,—এই তো বাবা, আমি এখানে ?

বুড়ো বলতো,—জানো বৌমা, তোমার শাশুড়ী বলতেন, বিপিন রইল, তোমার ভাবনা কী ! তা দেখো, তিনি কোথায় চলে গেলেন ধেই ধেই করে, বিপিনই বা কোথায় চলে গেল, তুমি পরের বাড়ির মেয়ে, তাই এই বুড়ো বয়েসে দুটো খেতে পাচ্ছি। আর ওই সতেরো টাকার পেনশন ! তারপর আমি যখন চলে যাব···

বুড়োর মৃত্যুর পর বৌমার কী হবে, তাই ভেবেই শ্বশুর মাঝে মাঝে ভারী ভাবনা করতো।

বলতো,—আমি চলে গেলে তোমার কী হবে; কথাটা ভাবি মাঝে মাঝে বৌমা!

তারপরেই হঠাৎ যেন একটা কথা মনে পড়ে গিয়েছে, এমনি-ভাবে বলতো,—বৌমা, তুমি এখনও সিঁথিতে সিঁদুর দাও তো ?

সুরেশ্বরীদিদি এ-কথার কোনও উত্তর দিতো না।

বুড়ো ডাকতো,—বৌমা, অ-বৌমা, বৌমা—

বৌমা পাশ থেকেই উত্তর দিতো,—এই যে বাবা আমি—

বুড়ো গলা নামিয়ে আবার জিজ্ঞেস করতো,—তুমি এখনও সিঁদুর দাও তো বৌমা ? কথা বলছ না যে, উত্তর দাও—

সুরেশ্বরীদিদি বলতো,—আপনি রাত্তিরে আজ কী খাবেন!

বুড়ো রেগে যেত। বলতো,—আমার খাওয়ার কথা রাখো কেবল খাওয়া, খাওয়া আর খাওয়া! খেয়ে খেয়ে আমার খাওয়ায় অরুচি ধরে গিয়েছে, না খেলে কী হয় ? আমি আজ খাবো না আমি উপোস করবো, না খেয়েই মরবো, এত লোক মরছে আমারই কেবল অক্ষয় পরমায়ু হয়েছিল!

তারপর নিজের মনেই বলতে থাকে,—কত লোক মরছে দিব্যি হাসতে হাসতে শ্মশানে চলে যাচ্ছে, আমারই কেবল ভোগ আমারই ডাক আসে না। তোমার শাশুড়ী পুণ্যাত্মা লোক, তিনি চলে গেলেন, বিপিনটাও পালিয়ে বাঁচলো, আমিই কেবল মরতে পড়ে আছি। আমি আজ থেকে আর পাঁচন খাবো না বৌমা আমায় তুমি পাঁচন দিতে পারবে না, পাঁচন দিলে আমি ছুঁড়ে নর্দমায় ফেলে দেবো, বুঝলে ?

তারপর আবার চিৎকার করে ডাকে—বৌমা, অ-বৌমা—

সুরেশ্বরীদিদি বলে,—কী ? বলুন ?

বুড়ো বলে,—আমার কথা শুনতে পেয়েছ ? আমি আজ থেকে আর পাঁচন খাবো না, পাঁচন দিলে আমি পাথর-বাটি সুদ্ধু নর্দমায় ছুঁড়ে ফেলে দেবো, বুঝেছ ?

কিন্তু এসব উচ্ছ্বাস সাময়িক। হয়তো আবার পরদিনই সকালবেলা বুড়ো ডাকতে থাকে—বৌমা, অ-বৌমা।

সুরেশ্বরীদিদি তখন রান্নাঘরে গোবর নিকোচ্ছে। বাইরে এসে বললে,—আমায় ডাকছিলেন বাবা ?

বুড়ো বললে,—আমার পাঁচনটা হয়নি বৌমা ?

রোজ রোজ সুরেশ্বরীদিদিকে যে-পরিশ্রম আর যে-অত্যাচারের মধ্যে জর্জরিত হতে হতো তার সাক্ষী ছিলাম আমি। আমিই কেবল জানতাম সুরেশ্বরীদিদির সেই দিনগুলোর একঘেয়ে ইতিহাসের কথা। সাধুবাবার সামনে সুরেশ্বরীদিদি যখন হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছিল, আর কেউ না শুনুক, আমিই একমাত্র শুনেছিলাম, সাধুবাবা কী বলেছিল!

সাধুবাবা একবার শুধু হাতটা দেখতে দেখতে চেয়েছিল সুরেশ্বরীদিদির দিকে।

বলেছিল,—তোমার কী প্রশ্ন আছে বলো মা?

সুরেশ্বরীদিদি লজ্জায় যেন আরও জড়সড় হয়ে গিয়েছিল।

আমিই তখন আগ বাড়িয়ে বলেছিলাম,—বলো না সুরেশ্বরী-দিদি? বলো?

সুরেশ্বরীদিদি কিন্তু কিছুই বলেনি।

সাধুবাবা নিজেই হাতটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছিল অনেকক্ষণ। তারপর বলেছিল,—তুমি রাজরানী হবে মা, তোমার কপালে অনেক সুখ—

বলে সাধুবাবা সুরেশ্বরীদিদির হাতটা ছেড়ে দিয়েছিল। সুরেশ্বরীদিদি আর কোনও কথা জিজ্ঞেস করেনি।

আমিই তখন এগিয়ে গিয়ে বলেছিলাম,—সুরেশ্বরীদিদির স্বামী অনেকদিন হলো নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছেন, তিনি কি ফিরবেন?

সাধুবাবা বলেছিল,—ফিরবে!

ফিরবে বলতেই সুরেশ্বরীদিদি কেমন থরথর করে কেঁপে উঠলো। হঠাৎ কাপড়টা ঠিক করে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। আমিও কিছু বুঝতে না পেরে সুরেশ্বরীদিদির সঙ্গে উঠে পড়লাম। সুরেশ্বরীদিদি ভোলাদের বাড়ি ছেড়ে বাইরের রাস্তায় এসে পড়লো। বেলগাছের ছায়ার তলায় এসে খানিক দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবলে। ভোলাদের বাড়িতে তখন অনেক লোকের ভিড়। এখান থেকে ওখান থেকে, এ-পাড়া থেকে ওপাড়া থেকে লোক আসছে আর আসছেই। সাধুবাবা সেইদিনই চলে যাবে। আর সময় নেই। বহু রোগী, বহু দুঃখী লোক ভিড় করেছে বাড়িতে।

সুরেশ্বরীদিদি যেন লজ্জায় মরে যাচ্ছিল।

বললে,—চল তুই আগে আগে—

আমি বললাম,—বিপিনদা তো ফিরবে বললে—না সুরেশ্বরী-দিদি ?

সুরেশ্বরীদিদি তখন মাথার ঘোমটাটা আরও নিচু করে দিয়েছে। পাছে কেউ দেখে ফেলে।

আমার কথাটা শুনে বললে,—তুই চল তো···রাস্তায় কথা বলিসনি—

বুড়ো শ্বশুর বললে,—তা জিজ্ঞেস করলেই পারতে বৌমা, বিপিন ফিরবে কিনা—

সুরেশ্বরীদিদি তখন উনুনে আগুন দিতে গিয়েছে। অনেকক্ষণ বাইরে থাকতে হয়েছে। সংসারের অনেক কাজ পড়ে রয়েছে।

শ্বশুর বললে,—আমাদের আপিসের রবার্টসন সাহেব সাধু-সন্ন্যিসী দেখলে ভারী ভক্তি করতো, জানো বৌমা···তা বিপিন যদি ফিরতো তো নিশ্চয়ই বলে দিতো সাধু, ওরা শুধু মুখ দেখেই সব ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান বলে দিতে পারে। অনেকে ত্রিকালজ্ঞ হয় কিনা—

কয়েকদিন বাদেই একদিন বাইরে সাইকেলের ঠিং ঠিং আওয়াজ হলো আবার।

শ্বশুরের কান বড় কড়া। বললে,—বৌমা, ওই ট্যাক্সের টাকা চাইতে এসেছে—

সুরেশ্বরীদিদি পেতলের ঘটিতে হাতটা ধুয়ে বললে,—আপনি বসুন, আমি দিচ্ছি—

শ্বশুর বললে,—না না, তুমি কেন দেবে বৌমা, আমিই দিচ্ছি, আমায় টাকাটা দাও, হাতটা ধরে দরজা পর্যন্ত একটু এগিয়ে দাও—

যতীনবাবু লোক ভালো। বললে,—আপনি আবার কষ্ট করে কেন এলেন ?

শ্বশুর বললে,—আমি কষ্ট না করলে, কে কষ্ট করবে যতীনবাবু ! ঠিক সাতটা টাকা আছে তো ? বাজিয়ে নাও, আমি চোখে দেখতে পাই না, আমার বৌমা নিজে দেখে দিয়েছে।

যতীনবাবু বলে,—ঠিক আছে, আপনার বৌমা তো দেখে দিয়েছেন, ও আর বাজাতে হবে না।

শ্বশুর তবু ছাড়ে না। বলে,—না যতীনবাবু, তুমি বাজিয়ে নাও, আমার কান ঠিক আছে, আমি শুনি—

শেষ পর্যন্ত বাজাতেই হয়।

শ্বশুর বলে,—তুমি আসবে বলে বৌমা টাকাটা আলাদা করে রেখে দিয়েছিল। আমি খাবো না, তবু ট্যাক্সের টাকা ঠিক সময়ে দেবো যতীনবাবু, যেদিন আসবে সেদিনই পেয়ে যাবে, আমার বাড়িতে এসে ফিরতে হবে না তোমাকে।

যতীনবাবু রসিদ লিখতে লিখতে বলে,—সে আমি জানি।

শ্বশুর বলে,—হ্যাঁ, এই তুমি ট্যাক্সটা নিয়ে গেলে, এখন রাত্তিরে ভালো করে ঘুমোতে পারবো।

যতীনবাবু বলে,—তা কি আর আমি জানি না? এই এ-পাড়ায় ক'টা বাড়ি আছে, তাদের জন্যে আমায় ভাবতে হয় না। নতুন এসেছে ক'জন শেতলাতলায়, তারা বড় ভোগায়। তা এখন কেমন আছেন?

শ্বশুর বলে,—আছি, সেইরকমই আছি, চোখেই শুধু দেখতে পাই না। বাড়ির মধ্যে পড়ে থাকি আর দিন গুনি।

যতীনবাবু সান্ত্বনা দেয়, বলে,—তা চিকিৎসা করালেই পারেন চোখটার, আজকাল তো অপারেশন করে ভালোও হচ্ছে কত লোক—

শ্বশুর বলে,—আমার আর ভালো হয়ে দরকার নেই যতীনবাবু। বিপিনই নেই, ও-চোখ থাকলেও যা, না থাকলেও তাই—বুঝলে?

যতীনবাবু বলে,—আপনার আর কী এমন বয়েস?

শ্বশুর বলে, —বয়েসে কী করে যতীনবাবু। তা একবার ভাবি, চোখ গিয়ে ভালোই হয়েছে, চোখ থাকলেই তো যত নোংরা জিনিস দেখতে হতো।

—তা যা বলেছেন!

যতীনবাবু নিজের ব্যাগটা গুছিয়ে নিতে নিতে বলে,—সে-সব আপনাদের কাল আর নেই, গবরমেণ্টও কিছু দেখছে না, যার যা খুশি তাই করছে। সব দেখে শুনে বুঝেছি, চোখ বুজে থাকাই ভালো সব চেয়ে—

সুরেশ্বরীদিদি তখন উনুনে কড়া চাপিয়েছে। কড়া ততক্ষণে

বোধহয় পুড়ে ঝামা হয়ে গেল। অথচ চলে যাওয়াও যায় না। শ্বশুরকে দরজার বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল। শ্বশুর এলে তবে আবার হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসাতে হবে।

শ্বশুর তখনও কথা বলছে। কথা বলবার লোক পেয়ে যেন বেঁচে গিয়েছে।

বললে,—শেতলাতলার দিকে বুঝি অনেক নতুন বাড়ি হয়েছে যতীনবাবু?

যতীনবাবু বললে,—যেখানটায় মাঠ ছিল, দেখেছেন তো? পুকুরের পাশে? ওসব বাড়ি হয়ে গিয়েছে আজকাল। দু'হাজার করে কাঠা বিক্রি করেছে আড্যিরা।

—দু'হাজার?—দাসমশাই চমকে উঠলো।—জানো, ওই মাঠে এক হাঁটু জল জমতো, আমরা তো জানি, তখন তুমি হওনি, আমরা সব ধাস্সি খেলতাম ওই মাঠে! আমি, বটুক মিত্তিরের মেজছেলে গণনাথ,···আহা গণনাথ শুনলাম মারা গিয়েছে, ও আমার থেকে এক বছরের বড় ছিল—

যতীনবাবু বললে—যে রেলে কাটা পড়ে মরলো?

—হ্যাঁ, কী শরীর ছিল জানো ওর, ঘুগনিওলারা পাড়ায় এলে একেবারে আট আনার ঘুগনি খেয়ে ফেলতো। জগাকে তোমরা চিনতে?

যতীনবাবু যেন চিনতে পারলে না। বললে,—জগবন্ধু বোস?

—আরে না, গোলক ভট্চায্যির ছেলে জগত্তারণ—

—ও, চিনি, তিনি তো বাতে একেবারে পঙ্গু হয়ে আছেন। ট্যাক্স আনতে গেলে দেখা হয়, বসে বসে তামাক খান আর খবরের কাগজ পড়েন—

দাসমশাই বললে,—দেখো, এখনও বাত হোক আর যা-ই হোক, চোখটা তো আছে। চোখই হলো সব, তাই তো বলি বৌমাকে, চোখ যদি থাকতো তো কার পরোয়া বলো না। আমার হাত-পা কান-দাঁত সব ঠিক আছে, খিদেও আছে, ঘুমও আছে। জানো, কেবল যেটা না-থাকলে সব কিছু থাকাই মিথ্যে, সেইটেই নেই। এই দেখো, আমার দাঁত দেখো—

বলে দাসমশাই হাঁ করলে। দাঁতের দুটো পাটি একেবারে

যতীনবাবুর মুখের সামনে ছড়িয়ে ধরলে। বললে,—একটাও বাঁধানো দাঁত নয়, সব নিজের; নড়ে না, ব্যথা করে না, কিচ্ছু না—

যতীনবাবু বললে—বিপিনদার আর খবরটবর কিছু পাননি?

খেতে বসে শ্বশুর বললে—বৌমা, এটা কীসের তরকারি গো?

সুরেশ্বরীদিদি বললে—ওলের ডালনা—একটু ধরে গিয়েছে, কড়ায় চড়িয়ে…

শ্বশুর বললে—ধরিয়ে ফেললে? তাই যেন কেমন গন্ধ গন্ধ লাগছে—

সুরেশ্বরীদিদি বললে—তখন ট্যাক্স নিতে এসেছিল—এদিকে—

মনে আছে হঠাৎ একদিন টিপি-টিপি পায়ে সুরেশ্বরীদিদির ঘরে যেতেই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। দেখলাম সুরেশ্বরীদিদি পেছন ফিরে আয়নায় নিজের মুখটা দেখছে। আমি গিয়েছি, তখনও টের পায়নি। ছোট একটা চৌকো কাঠের দাঁড়া-ফ্রেমের আয়নাতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজের মুখখানা দেখছে।

পেছন থেকে হঠাৎ শ্বশুরের গলা শোনা গেল,—বৌমা, অ-বৌমা—

শ্বশুরের ডাকে পেছন ফিরতেই সুরেশ্বরীদিদি আমাকে দেখে চমকে উঠেছে।

বললে,—কী রে; তুই কখন এলি?

আমাকে দেখে কখনও এমন করে চমকে ওঠে না সুরেশ্বরীদিদি। আমিও সুরেশ্বরীদিদিকে দেখে কেমন যেন অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। যেন খোঁপাটা পাতাকাটা, মুখটা সাবান-ঘষা। কাপড়টা ফরসা। আর তারপরে রোজই যেন একটু সাজা-গোজা চেহারা দেখতে পেতাম। বাদামতলার চেহারাও যেন সেই থেকে একটু বদলাতে লাগল। আমার চোখ বদলালো, না সুরেশ্বরীদিদি বদলালো, তা বলতে পারি না। পেল্লাদ চৌধুরীদের দরোয়ান চৌবেজী বুড়ো মানুষ। সমস্ত মাথাটা কামান। রাত এগারটা পর্যন্ত রামচরিত পড়তো। ভারী বিশ্বাসী দরোয়ান।

পেল্লাদ চৌধুরীকে আমরা দেখেছি। কারবার নিজে আর দেখতেন না শেষ বয়েসে। বহুদিনের কারবার। আর কারবার

কি একটা! কতরকমের লোক এসে বসে থাকতো পেল্লাদ চৌধুরীদের বৈঠকখানায়। বৈঠকখানার দরজাটা দিনরাত খোলা পড়ে থাকতো। ভেতরে একটা বারো হাত চওড়া বারো হাত লম্বা ফরাশের ওপর ময়লা চিট শতরঞ্চি পাতা থাকতো। ভদ্রলোক, ছোটলোক, কারবারী লোক, সবাই এসে বসতো, শুতো সেখানে। আর ছিল খান দুই বেঞ্চি। কাঠের বেঞ্চির গায়ে ময়লা পড়ে পড়ে এক ইঞ্চি পুরু ময়লা জমে গিয়েছিল। কয়েকটা হুঁকো, কল্‌কে, তামাক-টিকের সরঞ্জাম সাজানো থাকতো এককোণে। যখন কর্তার সঙ্গে দেখা করার দরকার হতো কারও, ভেতরে খবর যেত, ডাক পড়তো ভেতরে। পেল্লাদ চৌধুরী ওপরে থাকতেন। ছেলে-নাতি-নাতনীতে ঘর বোঝাই। আমরা বাড়ির মধ্যে উঠোনে গিয়ে দেখেছি, একজন বঁটি নিয়ে মাছ কুটতে বসেছে, একজন খড় কাটছে, একজন উঠোন ঝাঁট দিচ্ছে, ছেলে-মেয়েরা লাফালাফি খেলাধুলা করছে। কোথায় কোন ঘরে বউরা, বড়রা থাকতো, কী করতো, তার হিসের পাওয়া যেত না বাড়ির ভেতরে ঢুকলে। শেতলাতলায় ছিল পেল্লাদ চৌধুরীর আস্তাবলবাড়ি। সেখানে থাকতো ঘোড়ার গাড়ি। বিকেলবেলা পেল্লাদ, চৌধুরী বেরোতেন বেড়াতে। গাড়িটা ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে এসে থামতো বাড়ির সামনে। আর পেল্লাদ চৌধুরী এসে গাড়িতে উঠতেন। স্পষ্ট মনে পড়ে চেহারাখানা। পাকা আমের মতো চেহারা। গালের মাংস ঝোলা-ঝোলা। পেল্লাদ চৌধুরী নেমে আসতেন, চাকর-বাকর সব তখন সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতো। তিনি একটা পাকানো ছড়ি নিয়ে এসে উঠতেন গাড়িতে আর কী যেন চুষতেন। কী চুষতেন তা জানি না। হরতুকি, কিংবা লবঙ্গ, কিংবা কিশমিশও হতে পারে। দাঁত ছিল না একটাও—

এসব অন্য গল্প। পেল্লাদ চৌধুরীর গল্প বলতে গেলে আর একটা বই হয়ে যায়। বাদামতলার আদিকথার সঙ্গে পেল্লাদ চৌধুরীদের আদিকথার অনেক মিল আছে। পেল্লাদ চৌধুরীদের জমি-জমা-পুকুর বাদামতলায় ছড়ানো ছিল। ওই যে আদিগঙ্গার তীর ঘেঁষে যে জমি, আর টিনের গোলা-ঘর আর ধান-চালের আড়ত দেখছ, আর এখন যেখানে ছোট-বড় নানা কারখানার পত্তন হয়েছে, দিন রাত সামনে দিয়ে গেলে ঠুকঠাক শব্দ শোনা যায়,

ওসব পেল্লাদ চৌধুরীদের সম্পত্তি ছিল। সেই সমস্ত সম্পত্তি উড়তে উড়তে······

কিন্তু সে-সব কথা এখানে নয়।

এখানে সুরেশ্বরীদিদির গল্প বলতে গিয়ে যেটুকু বলা দরকার, সেইটুকু তোমাদের বলবো শুধু। চৌবেজীর গল্প না বললে সুরেশ্বরীদিদির গল্প অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, তাই চৌবেজীর গল্প একটুখানি বলে নিই।

ঘটনার আগের দিনও চৌবেজীর তুলসীদাসী রামচরিত-মানস পড়া শুনেছি। অনেক রাত পর্যন্ত আওয়াজটা কানে এসেছিল।

সেদিন সন্ধ্যেবেলাও আমাদের একটা হাঁস খুঁজতে বাদামতলার পুকুরে গিয়েছি। সবগুলো হাঁসই ঠিক সন্ধ্যের আগে পুকুর থেকে উঠে আসে বাড়িতে। সেদিন একটা আসেনি। আমি পুকুরের ধারে গিয়ে ডাকছি চই-চই-চই-চই—

সে অন্ধকার রাত। ওপাশে শেতলাতলার দিক থেকে কয়েকটা রাস্তার আলো পড়ে জলের ঢেউগুলো চিকচিক করছে। পেল্লাদ চৌধুরীদের বাড়ির পৈঁঠের কোণের ওপর কর্পোরেশনের তেলের বাতিটা টিম টিম করে জ্বলছে······

—চই চই চই চই—

চই-চই ডাক শুনতেই হাঁসগুলো প্যাঁক প্যাঁক করে ডেকে ওঠে।

কিন্তু সেদিন কোনও সাড়াশব্দ নেই কোথাও। ওধারে পুকুরের পুব গাঁয়ে জেলে-পাড়ার বস্তির বাড়িগুলোতে লম্ফ জ্বলছে। কে বুঝি ঘাটে এসে বাসন মাজছে—

হঠাৎ দেখি কয়েকজন লোক পুকুরের ধারেই আসছে। পাঁচ-ছ'জন। আসতে আসতে একেবারে আমার কাছে এস গেল। কাছে আসতেই দেখি পুলিশ!

পুলিশ দেখে চমকে উঠেছি। হাতে লাঠি, টর্চ। মাথায় লাল পাগড়ি। সঙ্গে দু'-একজন দারোগা, সাদা কোটপ্যাণ্ট পরা।

আমার পাশ দিয়েই তারা চলে গেল। গিয়ে ঢুকলো পেল্লাদ চৌধুরীদের বাড়িতে।

আমার আর হাঁস খোঁজা হলো না। বাবা বাড়ি এসে বললে, —কী রে, হাঁস পেলি না? গেল কোথায়?

বললাম,—ভয় করতে লাগল!

বাবা বললে,—ভয় কিসের?

বললাম,—পুলিশ এল পেল্লাদ চৌধুরীদের বাড়িতে।

বাবাও কেমন যেন অবাক হয়ে গেল। পরে অবশ্য বাদামতলার সবাই-ই অবাক হয়ে গিয়েছিল। সুরেশ্বরীদিদি আর তার শ্বশুরও অবাক হয়ে গিয়েছিল। বাবা, মা, ফটিক কাকা, সুজিতের জ্যাঠামশাই, কার্তিকের মেসোমশাই, ভোলা, আমি, সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

শুনলাম, পরদিনই পুলিশ এসে পেল্লাদ চৌধুরীর দরোয়ান চৌবেজীকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। কী অপরাধ? না পেল্লাদ চৌধুরীর পাঁচ বছরের নাতনী আহ্লাদীর কানের সোনার দুল চুরি করেছে চৌবেজী!

সেই পেল্লাদ চৌধুরীর দরোয়ানকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত অনেক হয়রানি হলো পুলিশের। পুলিশের বড়কর্তা থেকে দারোগা পর্যন্ত সবাই অনেক জেরা, অনেক তোষামোদ করলো। অনেক ভয় দেখাতেও লাগল! চৌবেজী ভাঙে তো মচকায় না—শেষকালে…

কিন্তু তার আগে একটা ঘটনার কথা বলি…

এর ঠিক কয়েক বছর পর একদিন কী হলো শোন!

একদিন বৌবাজারের রাস্তা দিয়ে আসছিলাম। হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন ডাকলে—শুনছেন ও-মশাই—

বৌবাজারের ফুটপাথে হাঁটা অসুবিধে। অনেক স্টল অনেক ফেরিওলার ভিড় পেরিয়ে সন্তর্পণে হাঁটতে হয়। দু-তিন ফুট চওড়া রাস্তা। পথের পাথরগুলোও উঁচু-নিচু। পথচারীর ধাক্কা বাঁচিয়ে চলতে গিয়ে সব সময় চলা সম্ভব নয়। কয়েকটা দোকানে আলো জ্বেলেছে, কয়েকটির তখনো জ্বলেনি। বাদামতলায় এ রকম হয় না। বাদামতলায় বসতি কম, আবার ব্যস্ততাও কম। তবু বাদামতলার লোকেদের নানাকাজে বৌবাজারে, কলেজ স্ট্রীটে, আপিস পাড়ায় আসতেই হয়। বৌবাজারে আসতে গেলে বাদামতলার লোকেরা বলে কলকাতায় যাচ্ছি।

বাদামতলার রাস্তায় তখন অবশ্য ইলেকট্রিক আলো হয়েছে, ড্রেন বসেছে। দু-একটা বাসও চলে। কিন্তু কিছু কেনাকাটা করতে গেলে আসতে হয় কলকাতায়। আপিস করতে যেতে হয় ডালহৌসি স্কোয়ারে। সারাদিন কাজকর্ম আপিস দোকান ঘোরা-ফেরার পর যারা বাদামতলায় থাকে তারা বাসে উঠে কোণের জায়গাটা নিয়ে বসে। বেশ নিরিবিলি কোণটিতে বসে একেবারে শেষ স্টপে গিয়ে নামবে। ধর্মতলায় কিছুলোক উঠবে বটে। কিন্তু তাদের দৌড় ভবানীপুর, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-এর মোড় পর্যন্ত। তারপর বাস ফাঁকা হয়ে যায় প্রায়ই। তখন শুধু ক'জন বাদামতলার যাত্রী। ওপাশে যতীনবাবু, পেছনের সিটে রাখালবাবু, পাশের সিটে সুবোধবাবু এমনি চেনা-শোনা মুখ কয়েকটা। এরা সব গিয়ে নামবেন একেবারে বাদামতলার পার্কের সামনের বাস-ডিপোতে।

সুবোধবাবু হয়তো জিজ্ঞেস করেন,—কী যতীনদা, কপিজোড়া কত নিলে?

রাখালবাবু পাশ থেকে বলেন,—এ কী আজ এত রাত্তির যে?

লেডিজ সিটে দু-একজন মহিলাও যদি বসে থাকেন, তো তাঁরা বাদামতলার নতুন অধিবাসী। বাদামতলাতে তখনও ঘর ভাড়া পেতে প্রাণ বেরিয়ে যায়। কেউ যদি দু'খানা ঘর তোলে তো রাজ-মিস্ত্রি খাটাবার প্রথম দিনটি থেকেই লোক আনা-গোণা শুরু করে।

বলে—ভাড়া দেবেন মশাই? দিন না, বড় কষ্টে আছি—

আগে বাদামতলাতেই লোকে যেতে ভয় পেতো, বলতো, বড় দূর তোমাদের বাদামতলা—

তা দূরই বটে। যখন বাস ছিল না এদিকে, তখন হেঁটে হেঁটে ভবানীপুরের জগুবাবুর বাজারের মোড় পর্যন্ত গিয়েছি একখানা মাসিক পত্রিকা কিনতে। সে-সব দিন এখন আর নেই। এখন খানিকটা হেঁটে বড় রাস্তায় পড়লেই বাস পাবে। তারপর কোণটিতে আয়েশ করে বসে পড়ো, এক ঘুমে পৌঁছে যাবে ডালহৌসি স্কোয়ারে।

হ্যাঁ, তারপর ডাক শুনেই পেছন ফিরলাম। বৌবাজারে কে আমাকে চিনবে? আমি বাদামতলার লোক, এদিকে আমার চেনা জানা তো কেউ নেই। একজন ফতুয়া পরা লোক। চাকর

শ্রেণীর চেহারা। আমাকে দূর থেকেই ডাকছে,—শুনছেন, ও মশাই—

দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। কাছে আসতেই বললাম,—আমাকে ডাকছ ?

লোকটা বললে,—হ্যাঁ, মা একবার ডাকছেন আপনাকে—

বললাম,—আমাকে ?

যেন সন্দেহ হলো। ভুল করেনি তো ? কোনও কালে লোকটাকে দেখেছি বলে মনে পড়লো না।

লোকটি আবার বললে,—হ্যাঁ, মা আপনাকে ডাকছেন।

—মা ?

যেন আকাশ থেকে পড়লাম। মা ! মা কে, কে জানে !

লোকটি বললে,—হ্যাঁ, ওই দাঁতের দোকানে মা রয়েছেন, আমাকে ডাকতে বললেন—

লোকটির পেছন পেছন চললাম। কিছু দূরে গিয়েই একটা দাঁতের ডাক্তারখানা। লোকটা আমাকে নিয়ে ভেতরে যেতেই দেখি স্নুরেশ্বরীদিদি !

সুরেশ্বরীদিদিকে দেখে আমিও কেমন অবাক হয়ে পড়লাম।

বললাম,—স্নুরেশ্বরীদিদি !

সুরেশ্বরীদিদির চেহারা আমূল বদলে গিয়েছে। সেই বাদাম-তলার সুরেশ্বরীদিদিকে আর চেনাই যায় না। গায়ে দামী দামী সোনার গয়না, পরনে শান্তিপুরী শাড়ি, পায়ে আলতা।

ডাক্তারকে দাম মিটিয়ে দিয়ে বললে,—এই জানলা দিয়ে তোকে দেখলাম, তাই ডাকতে বললাম অর্জুনকে।

তারপর শাড়ির আঁচলটা গুছিয়ে নিয়ে বললে—চল—এখন তোর কোনও কাজ নেই তো ?

রাস্তায় বেরিয়ে অর্জুন একটা ট্যাক্সি ডাকলে। সুরেশ্বরীদিদি বললে,—আয়, ভেতরে আয়।

সামনে ড্রাইভারের পাশে অর্জুন বসলো। আর পেছনে আমরা। আমি আর সুরেশ্বরীদিদি। সুরেশ্বরীদিদিকে এই অবস্থায় দেখে আমার যেন বাক্‌রোধ হয়ে গিয়েছে।

ট্যাক্সি চলতে লাগল বৌবাজার স্ট্রীট দিয়ে। চলতে চলতে পাশের একটা গলিতে গিয়ে ঢুকলো। তারপর বাঁদিকে। তারপর

আবার ডানদিকে। এমনি এঁকেবেঁকে কোথায় যে কতদূরে চলতে লাগল। আমি আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলাম।

আমার তখন কেবল বিপিনদার কথা মনে পড়তে লাগল। ছোট বয়েসে আমরা বিপিনদাকে দেখিনি। যখন বয়েস কম ছিল, শুনতাম, সুরেশ্বরীদিদির একজন স্বামী ছিল, কিছু না বলে কয়ে একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল। তার বহুদিন পরে একদিন বিপিনদা ফিরে এল। এই একমুখ দাড়ি গোঁফ। আমাদের বাদামতলার প্রভাস নাপিতকে ডেকে বললে,—বেশ আচ্ছা করে কামিয়ে দাও সব।

প্রভাস আমাদের বাড়িতেও কামাতো। বাবা-কাকাদের কামিয়েছে। আমাকেও কামিয়েছে পরে।

প্রভাস জিজ্ঞেস করলে,—এতদিন কোথায় ছিলেন দাদাবাবু ?

পাড়ার লোকজন সব এল। আমরাও দৌড়ে গেলাম দেখতে। কালো গোলগাল চেহারা। প্রথম প্রথম ভয় হতো কাছে যেতে।

বিপিনদার বাবা অন্ধ মানুষ। কাঁদতে লাগল ছেলেকে ফিরে পেয়ে। বড় অসহায় অবস্থায় দিন কেটেছে তার। বললে,—তুমি চলে গেলে খোকা, আর আমারও চোখটা গেল সেই থেকে—

বিপিনদা বললে—কিছু ভাবনা নেই, আমি আবার বিয়ে করবো।

বিপিনদা ছিল বাদামতলা হাইস্কুলের সেকেণ্ড মাস্টার। আমরা পাড়ার সব ছেলেই বাদামতলা ইস্কুল থেকে পাশ করেছি।

সুরেশ্বরীদিদি হঠাৎ পাশ থেকে বললে,—ক'দিন দাঁতের ব্যথায় যে কী কষ্ট পেয়েছি, দিনে খেতে পারি না, রাতে ঘুমোতে পারি না—

আমি আবার চাইলাম সুরেশ্বরীদিদির দিকে।

সুরেশ্বরীদিদি বললে,—আমার আবার পানের নেশা তো, পান মুখে না দিলে একদণ্ড থাকতে পারি না।

অথচ সুরেশ্বরীদিদিকে কখনও পান খেতে দেখেছি বলে মনে পড়লো না। যতবার দেখেছি সেই ক্ষার-কাচা শাড়ি, সেই উদয়াস্ত খাটুনি, সেই নিঃশব্দ সংসার-পরিচালনা। বাদামতলার সেই তখনকার দিনের কথাই আমার মনে পড়তে লাগল বার-বার। আজ অবশ্য সে-বাদামতলা নেই। সে-বাদামতলা সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে।

বাদামতলা বদলে গিয়েছে বলে কই কখনও তো অবাক হইনি কিন্তু সুরেশ্বরীদিদি বদলে গিয়েছে বলে এত অবাক হবার কী আছে! কিন্তু তবু মনে হলো বাদামতলার সেই পুরনো চেহারার সঙ্গেই যেন সুরেশ্বরীদিদিকে মানাতো ভালো! বাদামতলার সে-দিনগুলোর কথা আর কারও মনে থাক আর না থাক, আমার স্পষ্ট মনে আছে।

সুরেশ্বরীদিদি বললে,—নেমে আয়—

সুরেশ্বরীদিদি এখন অনেক মোটা হয়েছে। ট্যাক্সি থেকে নামতে বেশ কষ্ট হয়। অর্জুন দরজা খুলে দাঁড়িয়ে ছিল। অতি কষ্টে সুরেশ্বরীদিদি নামলো।

বললে,—সন্ধ্যে হয়ে গেল, এখনি আবার কর্তা এসে যাবে অর্জুন, ঠাকুরকে খিচুড়ির কথা বলেছিস তো?

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে,—দাঁতের যন্তরণায় ক'দিন খিচুড়ি ছাড়া কিছু খেতে পারছিনে, চিবুতে গেলেই কনকন করে মুখটা—

সুরেশ্বরীদিদির অন্যরকম সাজগোজ দেখে আমি তখন কেমন অবাক হয়ে গিয়েছি। কেবল ভাবতে লাগলাম এ কেমন করে হলো!

ট্যাক্সিতে বসেও সুরেশ্বরীদিদির মুখের দিকে চাইতেও ভরসা হচ্ছিল না। আজ কি সুরেশ্বরীদিদির সে-দিনকার কথা মনে আছে? যে-মানুষ শ্বশুরের কষ্ট হবে বলে একদণ্ড বাইরে যেতে চাইতো না, সেই মানুষই কি এই সুরেশ্বরীদিদি! অন্ধ শ্বশুরের কষ্ট হবে বলে নিজের সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে যে সুরেশ্বরীদিদি দিনের শান্তি রাত্রির আরাম ত্যাগ করেছিল, এ-ই কি সেই সুরেশ্বরীদিদি! আমার যেন কেমন সন্দেহ হচ্ছিল। একদিন এই সুরেশ্বরীদিদিকেই আধ-ময়লা কাপড়ে বাসন মেজে অন্ধ শ্বশুরের সংসার করবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করতে দেখেছি, আর আজ সেই সুরেশ্বরীদিদির গায়ে এত গহনার বাহার! পান না খেতে পারার জন্যে আফসোস করছে। নিজের চাকরকে নিয়ে নিজের টাকায় ট্যাক্সি চড়ছে।

নিজের চোখটাকেও যেন বিশ্বাস হলো না!

বললাম,—কোথায় যাচ্ছ সুরেশ্বরীদিদি?

সুরেশ্বরীদিদি বললে,—দেখ না, দাঁতের যন্তরণায় বড় কষ্ট

পেলাম ক'দিন। খেতে পারিনে, ঘুমোতে পারিনে, পান খেতে পারিনে, কী জ্বালা যে ক'দিন গিয়েছে—

দেখলাম নিজের অসুবিধে নিজের আরামের কথা বলতেই সুরেশ্বরীদিদি যেন বেশি ব্যস্ত! এ-সুরেশ্বরীদিদিকে তো আমি চিনি না। কেন এর সঙ্গে দেখা হলো?

সুরেশ্বরীদিদি হঠাৎ আবার বললে,—ক'দিন আগে আমার একটা খুব বিপদ গেল জানিস—

বললাম,—কীসের বিপদ?

সুরেশ্বরীদিদি বললে—আমার সতেরো হাজার টাকার গয়না দেরাজ থেকে চুরি হয়ে গেল হঠাৎ—

সতেরো হাজার টাকার গয়না! কেমন যেন খট করে বিঁধলো কানে। সতেরো হাজার টাকার গয়না ছিল সুরেশ্বরীদিদির! এত টাকার গয়না কেমন করে হলো!

সুরেশ্বরীদিদি বললে,—অথচ কী বিশ্বাসী লোক। আজ সাত বছর আমার কাছে কাজ করছে। হঠাৎ যে এমন করবে ভাবিনি—

তারপর একটু থেমে বললে,—তবু ভালো যে, আমার লোহার সিন্ধুকের চাবিটা নিতে পারেনি, নইলে চল্লিশ হাজার টাকার জড়োয়া ছিল তাইতে—

ট্যাক্সিটা এবার ডানদিকে ঘুরে একটা গলির মধ্যে ঢুকলো।

আমি নামলাম সুরেশ্বরীদিদির পেছন-পেছন। বেশ ভদ্রপাড়া। রাস্তাটার নাম দেখতে পেলাম না! এ-রাস্তায় আগে কখনও আসিনি। সামনেই একটা বাড়ি। বাড়িটার সামনে থেকেই ওপরে ওঠবার সিঁড়ি।

সুরেশ্বরীদিদি আবার বললে,—আয়—

আমি সঙ্গে সঙ্গে চলছিলাম। সুরেশ্বরীদিদি বললে,—বাড়িটার বাইরে এখনও বালির কাজ শেষ হয়নি, সিঁড়ির রেলিংটাও এখনও পাকাভাবে বসেনি, একটু ধরে ধরে আসিস্—

আমি আরও অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। সুরেশ্বরীদিদি কি নিজের পয়সাতেই বাড়ি করলো। এ কেমন করে হলো! কেমন করে হলো এ-সব! এই বাড়ি, এই টাকা, সতেরো হাজার টাকার সোনার গয়না, চল্লিশ হাজার টাকার জড়োয়া! সুরেশ্বরীদিদি যে

বেঁচে আছে, সেইটেই তো এতদিন জানা ছিল না। বাদামতলার পুরনো লোকেরা যদি এ-সব খবর জানে!

সঙ্গে সঙ্গে বিপিনদার কথাটাও মনে পড়লো!

বাদামতলার ইস্কুলের সেকেণ্ড টীচার বিপিনবাবু। অঙ্ক পড়াতো, ভূগোল পড়াতো, সংস্কৃত পড়াতো। শুনেছিলাম ইস্কুলে ক্লাশ করতে করতে একদিন হঠাৎ হেডমাস্টারকে বলে ইস্কুল থেকে বেরিয়ে আসে। তারপর কেউ দেখেছে গঙ্গার ঘাটে, কেউ দেখেছে কালিঘাট ইস্টিশানে, কেউ দেখেছে······

এবং শেষ পর্যন্ত আর বাড়ি ফিরে আসেনি, এইটেই ছিল মর্মান্তিক সত্য ঘটনা। এর বেশি কেউ জানতে চাইলেও জানতে পারেনি। এর পরে সুরেশ্বরীদিদির শ্বশুর চাকরি থেকে রিটায়ার করে ছেলের শোকে অন্ধ হয়ে গিয়েছে। আর সুরেশ্বরীদিদি মুখ বুঁজে দিনের পর দিন শুধু অন্ধ বুড়ো শ্বশুরের সেবা করে গিয়েছে।

ফটিক কাকা জিজ্ঞেস করেছিল—কিন্তু কোথায় গিয়েছিলে তা তো বললে না বিপিন?

প্রভাস নাপিত বিপিনদার দাড়ি-গোঁফ, মাথার চুল, সব কামিয়ে দিচ্ছিল। বললে,—ছোটবাবুর গুরুর নিষেধ আছে—আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম—

সেই বিপিনদা সুরেশ্বরীদিদিদের ঘর সারালে। ইস্কুলের চাকরি আবার নিলে। আজ এখনও সেই ইস্কুলে গিয়ে দাঁড়ালে বিপিনদাকে দেখা যায়। আবার সংস্কৃত ক্লাশে লতা শব্দের রূপ মুখস্থ ধরছে, ভূগোলের ক্লাশে ম্যাপে আঙুল দিয়ে ইংলণ্ডের চেহারা চেনাচ্ছে, অঙ্কের ক্লাশে এল-সি-এম, জি-সি-এম কষাচ্ছে। সুরেশ্বরীদিদিদের বাড়ির পেছন দিকে সেই আমড়া গাছটাও আর নেই, খেলার মাঠের শিশুগাছটাও নেই। সেখানে বস্তিদের নতুন তেতলা বাড়ি হয়েছে একটা। বিপিনদা বাড়িটার ভোলও ফিরিয়ে ফেলেছে। বিয়েও করেছে।

কিন্তু তার আগের কথা কিছু বলে নিই।

ভোলাদের বাড়ি থেকে সাধুবাবা চলে যাবার ক'দিন পরেই হৈ চৈ পড়ে গেল বাদামতলায়।

ফটিক কাকার পোয়াতি মেয়ে এসেছিল বাপের বাড়িতে।

প্রথম পোয়াতি। ক'দিন পরেই ফটিক কাকার নাতনী হলো। কী-হবে কী-হবে, দেখবার জন্যে সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল। ফটিক কাকার জামাই বেহারে না পাঞ্জাবে কোথায় ভালো চাকরি করতো। তবু প্রথম পোয়াতি, বাপের বাড়িতে ছেলে হওয়াই নিয়ম। আর ভয়ও ছিল ফটিক কাকার। প্রথম তো!

কিন্তু ছেলে হবার পর দেখা গেল, ছেলের দুটো হাতে ছ'টা করেই আঙুল বটে। ছ'টা করে, বারোটা!

সবাই ভিড় করলো ফটিক কাকার বাড়িতে। মেয়েদেরই বেশি ভিড়। মা, কাকিমা, জ্যাঠাইমা দেখতে গেল।

—ওমা, সত্যিই তো, সাধুবাবার কথা তো ঠিক-ঠিক ফলে গেল মা!

সুরেশ্বরীদিদির শ্বশুর বললে—বৌমা দেখেছ, আমি বলেছিলাম তোমাকে আমাদের রবার্টসন সাহেবেরও ভক্তি ছিল সাধু-সন্ন্যিসীদের ওপর,—ওরা ত্রিকালজ্ঞ—তুমি জিজ্ঞেস করলে না কেন বিপিন ফিরবে কিনা—

সুরেশ্বরীদিদি এসব কথার কোনও জবাব দিতো না।

একদিন আমি বলেছিলাম—আমি জিজ্ঞেস করেছি—

—কে রে? এ কে বৌমা? বটুক মিত্তিরের নাতি বুঝি?

তারপর আমার দিকে তার ঝাপসা অন্ধ চোখটা মেলে বলতো, —হ্যাঁ গো, ওদের সেই মস্ত লোহার গেটটা আছে?

তারপর আবার গল্প আরম্ভ হয়ে যেত।

—জানো বৌমা, ওদের ওই বটুক মিত্তিরের বাড়িতে একবার ডাকাত পড়েছিল। ওর ঠাকুর্দা নাজির ছিল কি না, ডাকাতরা জানতো কাঁচা টাকা থাকে ওদের বাড়িতে, সেই রাত্তির বেলা হৈচৈ, সে কী কাণ্ড শোনো—

একদিন দুপুরবেলা আবার ঠিং-ঠিং-ঠিং আওয়াজ!

ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর। শ্বশুরের কান খুব খাড়া। নাকও খুব কড়া। শব্দ গন্ধ কিছু এড়িয়ে যাবার উপায় নেই শ্বশুরের কাছ থেকে। সুরেশ্বরীদিদি হয়তো তখন আবার শ্বশুরের ধুতিখানা নিয়ে বসেছে।

অন্যদিন শ্বশুর ডাকে। সুরেশ্বরীদিদি কৌটো থেকে টাকাটা বার করে দেয়। তারপরে শ্বশুরের হাত ধরে দরজার বাইরে

পৌঁছে দিয়ে আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকে। শ্বশুরই কথা বলে। যতীনবাবুও আলাপী মানুষ। গল্প শুনতে ক্লান্তি নেই।

সুরেশ্বরীদিদি টাকাটা নিয়ে দরজার খিলটা খুললে। তারপর একটা পাল্লা ফাঁক করে টাকাসুদ্ধ হাতটা বাড়িয়ে দিলে বাইরে।

—দাসমশাই ঘুমোচ্ছেন বুঝি ?

ও-পাশ থেকে কোনও জবাব এল না।

—আজ না-হয় ফিরেই যেতাম, তাতে কী হয়েছে! এরকম আমাদের ফেরা অভ্যেস আছে—বলে সাইকেলের সিটের ওপর রসিদটা রেখে লিখতে লাগল। লেখা আর শেষ হয় না সুরেশ্বরীদিদি হাতটা বাড়িয়েই দাঁড়িয়ে ছিল। লজ্জায় বুঝি মরে যাবার অবস্থা!

—সাত টাকা আর বাজিয়ে নেবো না আপনার সামনে আপনার শ্বশুর থাকলে বাজিয়ে নিয়ে তবে ছাড়তেন!

রসিদ লিখতে লিখতে যতীনবাবু একটু থামলো।

বললে,—দেখুন না এইটুকু বাড়ি, দাসমশাই-এর পেনশনের ওপর ভরসা, তার ট্যাক্সই সাত টাকা! কাকে কী বলবো! গভরমেণ্ট কি বুঝবে?

বলে আবার লিখে চলে যতীনবাবু। এতটুকু এক চিলতে রসিদ লিখতে এত সময় কেন লাগে কে জানে!

—অথচ দেখুন, আমি তো কর্পোরেশনের চাকর ভিন্ন কিছু নই, আমাকে এই দুপুর বেলাই আপনাকে কষ্ট দিতে হলো।···এক গ্লাস জল দিতে পারেন, যা গরমটা পড়েছে—

জলের গেলাসটা একটু এগিয়েই দিতে হয়। মুখটা দেখতে পায় না যতীনবাবু, এই রক্ষে।

—বাঃ, জলে কর্পূর দিয়েছেন, ভালো করেছেন! কর্পোরেশনের যা জল, ওতে কী না রোগ আছে—বলে যতীনবাবু জলের গ্লাসটা বাড়িয়ে হাতে ঠেকিয়ে দেয়। আর সঙ্গে সঙ্গে রসিদটাও।

এই বোধহয় সূত্রপাত! কিংবা সূত্রপাত আগেই হয়ে গিয়েছিল।

শ্বশুর বললে,—আমাকে ডাকলে না কেন বৌমা? যতীনবাবু ট্যাক্সের টাকা নিয়ে গেল, রসিদটা নিয়েছ তো? কোথায় রাখলে? কৌঁড়নায় ফুঁড়ে রেখেছ তো?

তারপর খেতে বসেও চিন্তা যায় না শ্বশুরের।

বলে,—টাকাগুলো বাজিয়ে নিতে বলেছিলে ?

তারপর নিজেই আবার ভেবে বলে,—তা তুমিই বা কী করে বলবে! ইস, আমাকে ডাকতে হয়, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি বলে কি মরণ-ঘুম ঘুমিয়েছি ? আমার ঘুমই নেই। তুমি ভাবলে আমি বুঝি ঘুমিয়েছি, ওই একটু মট্‌কা মেরে পড়ে থাকি কেবল—

তারপর ঘুমোতে যাবার আগে বলে,—এর পরের বারে তুমি আমায় ডেকো বৌমা।

সুরেশ্বরীদিদি ঠিক বুঝতে পারে না। বলে,—কখন ডাকবো ?

—ওই যখন ট্যাক্স নিতে আসবে, আমাকে ডাকবে! আমি ঘুমিয়ে থাকলেও ডাকবে। ও আমার ঘুম নয়, বুঝলে বৌমা, ওকে ভাতঘুম বলে।

বুড়ো শ্বশুর কান পেতে থাকে কখন বটুক মিত্তিরের নাতি আসে বাড়িতে, কখন যতীনবাবুর সাইকেলের ঠিং ঠিং শব্দ শোনা যায়, কখন বৌমা রান্নাঘর থেকে পাঁচন নিয়ে আসে, কখন কার বাড়িতে কোন্ তরকারিতে কীসের ফোড়ন দিলে।

একদিন কিছু একটু সন্দেহ হলেই ডাকে,—বৌমা—বৌমা—

প্রত্যেক দিনই বৌমা এসে বলে,—কী বাবা ? কী চাই ?

কিন্তু একদিন আর সাড়া পাওয়া গেল না। একদিন সন্ধ্যে-বেলা বুড়ো ডাকলে,—বৌমা—

তারপর আরও জোরে ডাকলে,—বৌমা—আ—আ—

উঠোনে যেন কাদের পায়ের শব্দ হলো, আমড়া গাছের একটা শুকনো পাতা হাওয়ায় উড়ে এসে ঠেকলো মাথার চুলে। চুলে হাত দিয়ে সরাতে গেল, সেটা ততক্ষণে কোথায় পাশে উড়ে গেল আবার। সমস্ত বাড়ি নিঝুম, একটা ছম্-ছম্ নৈঃশব্দ্য যেন সারা আবহাওয়ায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। কাদের বাড়ির একটা পোষা বেড়াল পাঁচিল টপকিয়ে ভিতরে এসে রান্নাঘরে চুরি করে ঢুকতে গিয়ে বুড়োর দিকে চেয়ে দেখলে, তারপর নির্ভয়ে ঢুকে গেল ভেতরে। একটা পায়রা টবের জমা জলটা খেতে এসে নেমে পড়েছিল উঠোনে। বুড়োকে দেখে একবার ভয় পেয়ে উড়তে গেল, তারপর নির্ভয়ে জল খেতে লাগল!

এর পর আর সুরেশ্বরীদিদিকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। কত খোঁজাখুঁজি পড়লো। পুলিশে খবর দেওয়া হলো। পাড়ার

লোকজন তাই নিয়েই কত আলোচনা করতে লাগল। কিন্তু কোথাও আর খুঁজে পাওয়া গেল না সুরেশ্বরীদিদিকে।

সে-ক'দিন যে কী করে কাটিয়েছি সে শুধু আমিই জানি। তখন কারোর কথাই মনে পড়তো না। খেতে পারতাম না ভালো করে, ঘুমোতে পারতাম না ভালো করে। কেমন সব সময় মনে পড়তো সুরেশ্বরীদিদির কথা। কালীঘাট ইস্টিশানের দিকে গিয়ে ভাবতাম—এই প্যাসেঞ্জার ট্রেনের কামরাতেই উঠে হয়তো কোথাও চলে গিয়েছে সুরেশ্বরীদিদি। রেল-লাইনের ওপরে গিয়ে দাঁড়াতাম। চারদিকে পাগলের মতো চেয়ে দেখতাম! আমার চেনা জগতের কোনও কোণে কোথাও সুরেশ্বরীদিদিকে আর খুঁজে পেলাম না।

একদিন ভোলা বললে,—আমরা আবাদে চলে যাচ্ছি জানিস।

বললাম,—কেন?

ভোলা বললে,—আমাদের এই মাটির বাড়িতে আর থাকতে ভালো লাগছে না, দিদির বিয়ে হবে কি না—

—আবাদে বিয়ে হবে? কার সঙ্গে?

আমি জানতাম আবাদে ধান-চাল হয়, মাছ হয়, সাপ-কুমীর আছে আবাদে—সেখানে কি মানুষ থাকতে পারে। কিন্তু ভোলার কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। ভোলা চলে যাবে! একসঙ্গে এতদিন খেলেছি, কেমন যেন কান্না পেতে লাগল। সুরেশ্বরীদিদি নেই, ভোলাও থাকবে না, কী নিয়ে থাকবো!

ভোলা বললে,—তুই ভাবিসনি, আমি আবার আসবো। আমার বাবা ওখানে গিয়ে একটা জাহাজ কিনবে, সেই জাহাজে চড়ে আমরা কলকাতায় আসবো।

—আসবি তো ঠিক?

ভোলা বললে,—নিশ্চয়ই আসবো, দেখে নিস্, তোকেও জাহাজে চড়াবো। সে-জাহাজে চড়ে বিলেত যাব দু'জনে।

বিলেত! অনেক দূর সে যে! অনেক অনেক দূর! বাদামতলার ওই আকাশ যেখানে শেষ হয়েছে, ওই কালীঘাট ইস্টিশানের ওদিক, রেললাইন পেরিয়ে ডায়মণ্ডহারবারের সমুদ্র, সেই রকম সাতটা সমুদ্র পেরিয়ে তবে তো বিলেত!

কার্তিক বললে,—না রে, আমার বাবা বলেছে ভোলারা বাড়ির ভাড়া দিতে পারেনি বলে ওদের তাড়িয়ে দিয়েছে, ওরা যে সাত মাস ভাড়া দেয়নি বাড়ির—

বললাম,—কখনো তা হতে পারে না। ওরা জাহাজ কিনবে জানিস, আমায় জাহাজে চড়াবে!

ভোলারা কোথায় চলে গেল জানি না। হয়তো জাহাজ কিনেছিল, কলকাতায়ও এসেছিল জাহাজে চড়ে, কিন্তু বাদামতলায় আর আসেনি। বাদামতলায় তারপর ইলেকট্রিক হয়েছে। ভোলাদের সেই মাটির বাড়ির ওপর তেতলা পাকা বাড়ি হয়েছে বেনেদের। সেই বেলগাছটাও আর নেই। তুষপুকুর, সেই যে-তুষপুকুরের পাশের সরু রাস্তাটা দিয়ে ভোলার বাবা ছাতি আর হুঁকো নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে আসতো, সে-তুষপুকুরও মাটি ভরাট করে কাঠা প্রতি দু'হাজার টাকা দরে বিক্রি হয়ে দোতলা বাড়ি হয়েছে মাটালিদের। রাস্তায় রাস্তায় পিচ হয়েছে। সেই ঝারি দেওয়া জলের গাড়ি আর নেই, এখন নল দিয়ে গঙ্গার জল ছিটিয়ে দেয় রাস্তায়। সে-সব ফেরিওলারাও আর আসে না। নতুন নতুন মুখ, নতুন নতুন মানুষ।

শুধু বিপিনদার বাড়িটার অদল-বদল হয়েছে সামান্য। সামনে একটা বাঁধানো রোয়াক হয়েছে। যেখানটায় এসে যতীনবাবু ট্যাক্সের টাকা চাইতো, সেখানটায় আর দরজাটা নেই। বিপিনদা সামনেটা ভাড়া দিয়ে পিছন-দরজা দিয়ে যাতায়াত করে। দু'-এক-দিন দেখতে পাই ইস্কুলে যাচ্ছে, কোট গায়ে, শু পরা। কয়েক মাস আগে দ্বিতীয়পক্ষের মেজছেলের অন্নপ্রাশনে নেমন্তন্নও খেয়ে এসেছি—

আর চৌবেজী? যার চুরির কথা তোমাদের বলছিলাম!

পেল্লাদ চৌধুরীদের সেই মাছের ব্যবসা তখন আর নেই। চৌবেজীর খালি তক্তপোষটাও কোথায় চলে গিয়েছে।

মনে আছে সে-একদিন কী পুলিশ-আদালত হলো! পাড়াময় কী হৈ চৈ! এমন সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ, রোজ রামচরিত রামায়ণ পড়তো। বাতাসা প্রসাদ দিতো, সেই মানুষ এমন করে ছোট পাঁচ বছরের মেয়ের কানের সোনার দুল চুরি করবে, এ যে ভাবাও যায় না!

চৌবেজীকে পুলিশ-হাজতে রেখে দিয়েছিল।

পুলিশ এসে জিজ্ঞেস করলে,—চৌবেজী, তুমি এত সাধু লোক, তুমি কী করে চুরি করলে?

চৌবেজীর মুখে একটা উত্তরও নেই। শুধু চুপ করে বসে থাকে!

পেল্লাদ চৌধুরী বললেন,—আমিও তো তাই ভাবি মশাই, আমার মেয়ের বিয়ের সময় ওরই হাত দিয়ে আমি তেতাল্লিশ হাজার টাকার গয়নার বাক্স পাঠিয়েছি মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে।

আর শুধু কি মেয়ের বিয়েতে? পেল্লাদ চৌধুরীর নিজের বিয়ের সময়ও ওই চৌবেজী সব করেছে। বাড়ির সম্পত্তি ওই চৌবেজীর হাতে ছেড়ে দিয়ে, চাবি-তালা সব ওর হেফাজতে রেখে কাঁহা কাঁহা দিল্লী মথুরা ঘুরে বেড়িয়েছেন। কখনও একমাস, কখনও দু'মাস। চৌবেজী যে-মেয়ের গয়না চুরি করেছে, তার মাকেও সে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে। লক্ষ লক্ষ টাকার নোট চৌবেজীর হাত দিয়ে ব্যাপারীদের কাছে পাঠিয়েছেন পেল্লাদ চৌধুরী। ছেলেদের বিশ্বাস করেননি, জ্ঞাতিদের বিশ্বাস করেননি, কেবল বিশ্বাস করেছেন ওই চৌবেজীকে! চৌবেজী ছাড়া পেল্লাদ চৌধুরীর কাজ-কারবারই চলতো না, একদিন এমন দিন গিয়েছে। দশ হাজার টাকা এক দিনের মধ্যে দিয়ে আসতে হবে বড়বাজারের নসীরাম মুলুকরামের গদিতে, কে যাবে? না চৌবেজী! সেই চৌবেজী কি না একটা তুচ্ছ সোনার দুলের জন্যে···

দারোগা আবার হাজতের মধ্যে ঢুকলেন। বললেন,—ঠিক করে বলো তো চৌবেজী, কেন তুমি ওই সামান্য জিনিসটা চুরি করলে?

চৌবেজী কথার উত্তর দিলে না।

দারোগা সাহেব বললেন,—তোমার কি টাকার অভাব হয়েছিল?

কোনও উত্তর নেই।

—তুমি কি মাইনে পাওনি?

তবু কোনও উত্তর নেই।

—বাবুদের ওপর তোমার কি কোনও রাগ ছিল? তোমায় কি কেউ গালাগালি দিয়েছিল? বকেছিল?

তবু কোনও উত্তর নেই।

মনে আছে চৌবেজীর সেই চুরির ব্যাপার নিয়ে বাদামতলার লোকেদের ঘুম হয়নি কতদিন। কেন চুরি করতে গেল! কীসের অভাব হয়েছিল তার! যদি চুরিই করবে, তবে সামান্য তুচ্ছ একটা ছোট্ট মেয়ের কানের সোনার দুল কেন? বেশি টাকা চুরি করলে না কেন! কোথায় টাকা থাকে বাবুদের, কোন্ সিন্দুকে, কোথায় সে-সিন্দুকের চাবি থাকে, তা-ও চৌবেজীর অজানা নয়, তবু এ-মতি হলো কেন?

আর একজন নতুন দারোগা এলেন, বললেন,—দেখি আমি একবার চেষ্টা করে, বেটার কাছে কথা আদায় করতে পারি কি না!

ঘরে ঢুকে অনেক মিষ্টি কথা বলে তোয়াজ করতে লাগলেন চৌবেজীকে। খাওয়া হয়েছে কি না, কোনও অসুবিধে হচ্ছে কি না, অনেক আপ্যায়ন, অনেক খোশামোদ!

আমরা তখন ছোট। এ-সব গল্প আমরা শুনতাম রোজ। এই নিয়েই আলোচনা হতো রোজ পাড়ার বাড়িতে বাড়িতে।

তা সেই নতুন দারোগা বললেন,—আপনি তো মহা ধার্মিক লোক চৌবেজী, রামচরিত রামায়ণ পড়েন, ভাগবত গীতা পড়েন, আপনি এমন কাজ করতে গেলেন কেন?

চৌবেজী উত্তর দিলে না।

—আমাকে আপনি চুপি-চুপি বলুন, আমি আপনাকে ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা করে দেবো! বলুন আপনি? বলুন চৌবেজী, আপনার ছেলে নেই পুলে নেই, আপনার লোভ হলো কেন হঠাৎ?

আজ সুরেশ্বরীদিদির বাড়িতে এসে আমারও সেই কথাই মনে হচ্ছিল।

সুরেশ্বরীদিদিকে কখনও তো এমন অবস্থায় দেখিনি। সুরেশ্বরী-দিদি যে আমার ছেলেবেলার স্বপ্নের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল, সে-স্বপ্ন এমন করে কে ভাঙলো? কেন ভাঙলো?

মনে পড়লো সুরেশ্বরীদিদি বলতো—ছিঃ, ওকথা বলতে আছে?

আমি বলতাম,—কিন্তু তোমাকে দিনরাত এত খাটায় কেন তোমার শ্বশুর?

—তা খাটান, বুড়ো হলে তুইও অমনি হয়ে যাবি, বুড়ো মানুষের কি মাথার ঠিক থাকে ?

সেই সেদিনকার পুরনো সুরেশ্বরীদিদিই বা কোথায় গেল, আর সেই সুরেশ্বরীদিদির শ্বশুরই বা কোথায় গেল! বিপিনদা একদিন বিয়ে করে ফেললে। ছাদের মাথায় ম্যারাপ বাঁধা হলো, ন'বত বাজলো। বাদামতলায় পুরনো যারা তারা সবাই নেমন্তন্ন খেয়ে এলাম। সেদিন কোথায় ছিল এই সুরেশ্বরীদিদি! এই যে-সুরেশ্বরীদিদির সামনে বসে আছি, যার অনেক গয়না হয়েছে, যে-সুরেশ্বরীদিদির চাকর সতেরো হাজার টাকার গয়না চুরি করে পালিয়েছে, যে-সুরেশ্বরীদিদির চল্লিশ হাজার টাকার জড়োয়া গয়না চুরি করতে পারেনি!

সুরেশ্বরীদিদি অর্জুনকে বললে,—ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়েছিস ?

অর্জুন পেছনে-পেছনে আসছিল। বললে,—হ্যাঁ মা—

—সদর-দরজা বন্ধ করে দিস—

বলে ওপরে উঠতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে। আমিও পেছন-পেছন চলতে লাগলাম।

ঠাকুর এল। বললে—লুচি ভাজবো মা ?

সুরেশ্বরীদিদি বললে,—না ঠাকুর, আমি দাঁতের জ্বালায় মরছি, আমি লুচি খাবো না, শুধু বাবুর জন্যে কর।···বাবু এসেছে ?

আমার মনে পড়তে লাগল সেই ভোলাদের সাধুবাবার কথা। সাধুবাবা তো বলেইছিল—সুরেশ্বরীদিদির স্বামী ফিরবে। তার কথা তো সত্যিই হয়েছিল। ফলেছিল তার কথা। সব কথাই মিলেছিল। যাদের যাদের তাগা মাছুলি দিয়েছিল, তাদের রোগ সেরেছিল কি না খবর পাইনি, কিন্তু ফটিক কাকার নাতির তো দু'হাতে ছ'টা করে বারোটা আঙুলই হয়েছিল। কিন্তু রাজরানী! সুরেশ্বরীদিদি কি রাজরানী হয়েছে ? এই কি তবে সুরেশ্বরীদিদির রাজরানী হওয়া ?

সুরেশ্বরীদিদি বললে,—তোকে দেখে প্রথমে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, জানিস, গোঁফ টোফ উঠে একেবারে ভব্যিসব্যি হয়ে গিয়েছিস তো, তাই ঠিক চিনতে পারিনি, তাই অর্জুনকে দিয়ে ডাকতে পাঠালাম—

তারপর একটা ঘরে ঢুকে বললে—বোস তুই, আমি কাপড়টা বদলে আসি—

খানিক পরেই আবার ঘরে এসে বললে—তোর জন্যে ঠাকুরকে খাবার করতে বলে এলাম, আজ দিদির কাছে খেয়ে যা—

তারপর ভালো করে কাছে সরে এসে বসলো। দেখলাম, মাথার সিঁথিতে সিঁদুর। হাতে নোয়া, শাঁখা, সোনার চুড়ি, কানে দুল, নাকে নাকছাবি। সুরেশ্বরীদিদির অনেক পরিবর্তন হয়েছে, মনে হলো।

সুরেশ্বরীদিদি বললে,—চাকর-বাকর নিয়েই হয়েছে মুশকিল, এখন তাই চাবিটা নিজের কাছে রেখে দি—

বলে চাবিটা নিজের আঁচলে বেঁধে পিঠে ঝুলিয়ে দিলে।

মনে পড়লো ভোলার দিদির কথা। যে-দিদি আমাকে একেবারে দেখতে পারতো না। ভোলার দিদি ভাবতো আমিই বুঝি ভোলাকে খারাপ করে দিচ্ছি। আমার জন্যেই বুঝি ভোলা পুকুরে পুকুরে মাছ ধরে বেড়ায়, আমার জন্যেই ভোলা সারাদিন খেলা করে বেড়ায়। আমার জন্যেই ভোলা লেখাপড়া করে না। ভোলার ভালো-মন্দের জন্যে ভোলার দিদির কী ভাবনাই না ছিল। অথচ সেই ভোলার দিদিই কিনা একদিন মরো-মরো হয়ে ভালো-মন্দের বাইরে যেতে বসেছিল। আবার সেই ভোলাদেরই বাড়ি-ভাড়া না-দিতে পারার জন্যে কোথায় কোন্ আবাদের মধ্যে চলে যেতে হলো। কেন যেতে হলো!

আর বিপিনদা! বিপিনদাই বা কেন একদিন ইস্কুলের ক্লাশে লতা শব্দ পড়াতে পড়াতে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল? কীসের তাড়নায়? কেন? কোন্ আকর্ষণে? সংসারে বাবা ছিল, সুরেশ্বরীদিদির মতো স্ত্রী ছিল, চাকরি ছিল, স্বাস্থ্য ছিল, সৎ শিক্ষা ছিল, সবই ছিল। বাদামতলার আর পাঁচজন ভদ্রলোকের যা থাকে, তাই-ই ছিল। তার বেশি ছিল না, কমও ছিল না, কিন্তু তবু কেন চলে গিয়েছিল? আর যদি চলেই গিয়েছিল তো আবার ফিরে এল কেন? ফিরেই যদি এল তো আর কিছুদিন আগে ফিরে এল না কেন? আর যদি এলই তো আবার বিয়ে করতে গেল কেন?

আমাদের কথাই ধরি না কেন! আমাদেরও তো অনেক

কিছু ছিল। বটুক মিত্তিরের নাম-ডাক ছিল। কাঁচা টাকার লোভে আমাদের বাড়িতে ডাকাতও পড়েছিল। সেই তাদের বংশই বা এমন করে ভাগের ভাগ তস্য ভাগ হয়ে সব ছন্নছাড়া হয়ে গেল কেন? কেন আমার মাকে মস্ত বড়লোকের ঘরে জন্মেও সারাজীবন অভাবের মধ্যে আমাদের বাড়িতে কাটাতে হলো? যে-মা কখনও ছোটবেলায় নিজের হাতে বাসন মাজতে হবে স্বপ্নেও ভাবেনি, আমাদের বাড়িতে বউ হয়ে এসেও একদিনের জন্যে রান্নাঘরে ঢুকতে হয়নি, শেষকালে সেই মা খেটে খেটে অম্বলে ভুগে ভুগে অকালে মারা গেল কেন?

এই কেন'র জবাব কে দেবে?

সাধুবাবার কথা আমি বিশ্বাস করি না। কোষ্ঠীতেও বিশ্বাস করি না, হাত দেখাও বিশ্বাস করি না। কিন্তু সুখে ছিল যে-সুরেশ্বরীদিদি, অন্ধ শ্বশুরের সেবা করাকে মহাপুণ্যের কাজ বলে যে-সুরেশ্বরীদিদি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতো, নিজের স্বামীর ছবিটা শোবার খাটের মাথার দিকের দেয়ালে টাঙিয়ে যে-সুরেশ্বরীদিদি রোজ পায়ে ফুল দিতো, চন্দনের ফোঁটা দিতো, পুজো করতো, সেই সুরেশ্বরীদিদি কেন এমন······?

আর চৌবেজী? সেই পেল্লাদ চৌধুরীদের জাঁদরেল দরোয়ান, যার ভয়ে আমি আর ভোলা থরথর করে কাঁপতাম, যার বিশ্বস্ততায় পাড়ার কোনও লোকের সন্দেহ ছিল না, যে দিনরাত ভাগবত-গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, পুজোপাঠ নিয়ে থাকতো, মনিবের কল্যাণ কামনা করতো, যার হাতে লাখ-লাখ টাকার ভার দিয়ে পেল্লাদ চৌধুরী নিশ্চিন্তে বেড়াতে যেতেন, সে-ই বা নাতনীর বয়েসী মেয়ের কান থেকে সামান্য একজোড়া দুল চুরি করতে গেল কেন? এ-দুর্মতি তার কেন হয়েছিল?

আর একজন নতুন দারোগা এল। বললে,—তোমার কর্ম নয়, আমি দিচ্ছি বেটাকে ঢিট করে—

বলে হাজতের মধ্যে ঢুকে প্রণাম করলে চৌবেজীকে।

বললে,—কেমন আছেন চৌবেজী?

চৌবেজী কোনও উত্তর দিলে না।

দারোগা বললে,—রাত্রে নিদ্ হয়েছিল তো চৌবেজী?

এবারও উত্তর দিলে না চৌবেজী।

—পেট ভরেছে আপনার? খাওয়ার কোনও তক্‌লিফ নেই?

কোনও উত্তর দিলে না চৌবেজী এবারেও।

দারোগা এবার প্রশ্ন করলে,—সত্যি বলুন তো চৌবেজী, আপনি তো ধরমদার আদমী, এ ক্যায়সে হো সকৃতা?

স্বরেশ্বরীদিদি আপন মনেই নিজের গয়না, নিজের ঐশ্বর্য, নিজের স্বাস্থ্যের কথা বলে যাচ্ছিল। সবাই ঠকাচ্ছে, সবাই চারিদিকে কেবল টাকা-টাকা করে খেয়ে ফেলছে।

বললে,—আমি টাকা কোথায় পাবো বল্? আমার কি টাকার গাছ আছে? উনি তো একলা মানুষ, ক'দিক দেখবেন। আমি এই দাঁতের যন্তরণা নিয়ে সংসারের কিছু দেখতে পারিনি, সব নয়-ছয় হয়ে গিয়েছে। যেদিকে দেখবো না সেদিকেই চিত্তির—

তারপর আবার একটু থেমে বললে,—ঠাকুর—অ-ঠাকুর—

ঠাকুর এল।

স্বরেশ্বরীদিদি বললে,—বাবু আজকে মাংসেতে ঝাল দিতে বারণ করেছে, মনে আছে তো?

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে,—ক'দিন থেকে ওঁরও শরীরটা ভালো নেই। আমি নিজে যে রাঁধবো তারও উপায় নেই, ডাক্তার আমায় পই পই করে বারণ করেছে রান্নাঘরে যেতে—

সাধুবাবা বলেছিল,—তুমি রাজরানী হবে মা—রাজরানী হবে—

তা হলে এই কি রাজরানী হওয়া! এই কি রাজরানী হয়েছে স্বরেশ্বরীদিদি! এই চল্লিশ ভরি জড়োয়া আর সতেরো ভরি গয়না, এই কলকাতার বাড়ি, এই চাকর-বাকর, এই ঠাকুর-ঝি, এরই কথা বলেছিল সেদিন ভোলাদের সাধুবাবা!

হঠাৎ পাশের দিকে নজর পড়তেই দেখি দেয়ালে একটা মস্ত বড় ফ্রেমে বাঁধানো ছবি।

ও-কার ছবি!

যতীনবাবুর?

আমি লাফিয়ে উঠেছি।

—কী রে উঠলি যে? উঠলি কেন? বোস্, তোর যে খাবার করতে বলেছি ঠাকুরকে। বোস্ বোস্, এতদিন পরে দেখা হলো—এখুনি যাবি কী রে?

বললাম,—না সুরেশ্বরীদিদি, আমি উঠি।

—কোনও কাজ আছে নাকি?

বললাম,—না।

—তবে? তবে বোস্ না, কিছুই তো গল্প হলো না তোর সঙ্গে—

আমি সিঁড়ি দিয়ে সোজা নামতে লাগলাম।

সুরেশ্বরীদিদিও সোজা এসে দাঁড়ালো আমার সামনে। বললে,—কেন, চলে যাচ্ছিস কেন, বল্ তো? কী হলো তোর? তুটো গল্প করবার জন্যে তোকে নিয়ে এলাম, এতদিন পরে দেখা—

আমার মাথায় তখন যেন আগুন ধরে গিয়েছে। একবার মনে হলো দরকার নেই বলে, আবার ভাবলাম এ কেমন করে হয়? কেন হয় এমন?

সুরেশ্বরীদিদি বললে,—কী রে, কী ভাবছিস?

বললাম,—আচ্ছা, সুরেশ্বরীদিদি···

বলতে গিয়েও যেন বেঁধে গেল কথাটা।

সুরেশ্বরীদিদি হেসে উঠলো। বললে,—কী রে, থামলি কেন? কী বলছিলি?

বললাম,—এ কেমন করে হলো সুরেশ্বরীদিদি? এ কেমন করে সম্ভব?

পুলিশের দারোগাও ঠিক সেদিন এই প্রশ্নই করেছিল চৌবেজীকে,—এ ক্যায়সে হো সক্তা চৌবেজী! এ ক্যায়সে হো সক্তা?

আমার চোখ দিয়ে বোধ হয় তখন আগুন ছিটকে বেরোচ্ছে।

বললাম,—তোমার তুটি পায়ে পড়ি সুরেশ্বরীদিদি, তুমি আমাকে বলো—এ কেমন করে হলো? এ কেমন করে হওয়া সম্ভব?

সিঁড়ির কাছে আলো তেমন ছিল না। ঘরের আলোর খানিকটা এসে পড়েছে বাইরে। সেই আলোতেই দেখলাম সুরেশ্বরীদিদির মুখটা কেমন যেন হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে এল। যেন পড়ে যাবে এখুনি। তু'হাত বাড়িয়ে যেন কী ধরতে গেল হঠাৎ। আমি খপ্ করে সুরেশ্বরীদিদিকে ধরে ফেললাম। ধরে না ফেললে হয়তো পড়েই যেত। তারপর সুরেশ্বরীদিদির চোখ দিয়ে ঝরঝর

করে জল পড়তে লাগল। সে-জল আমার গায়ের ওপর পড়ে জামাও ভিজতে লাগল।

চৌবেজীরও কী যে হলো! এতদিন এতবার এত প্রশ্নের কোনও জবাব দেয়নি চৌবেজী। হঠাৎ তার চোখ দিয়েও অঝোর ধারায় জল ঝরতে লাগল। তারপর এক সময়ে মুখ নিচু করে চৌবেজী বললে,—বাবুজী, যব্ হোতা হ্যায়, তব্ য়্যায়সাই হোতা হ্যায়—

সুরেশ্বরীদিদিও হঠাৎ ভেঙে পড়লো। মুখ নিচু করে বললে, —তোকে আর কী বলবো যখন হয় তখন এমনি করেই হয় রে—

বললাম—তারপর ?

তোমরা তো তারপর বলেই খালাস। কিন্তু যত সহজে ঘটনাটা ঘটলো, তত সহজে কিন্তু সেটা আমি গ্রহণ করতে পারিনি। মনে হয়েছিল আমিই যেন সুরেশ্বরীদিদির চোখ দিয়ে কেঁদেছি সেদিন। সুরেশ্বরীদিদির লজ্জা যেন আমারই লজ্জা। সুরেশ্বরী-দিদির অপমান যেন আমারই অপমান। তাই তো নিজের সেই লজ্জা আর নিজের সেই অপমানের কথা সেদিন কাউকেই বলতে পারিনি আমি। এর পর ভেবেছিলাম সমস্ত অপমানের লজ্জা ঢেকে সোজাসুজি মাথা উঁচু করে বুক ফুলিয়ে বেড়াবো। চোখের অগোচরে যে-ঘটনা ঘটেছে মনের অগোচরেই তা লুকিয়ে ফেলবো। কেউ তা জানতে না-পারলেই হলো। কিন্তু আর একটা অপমান কেমন করে আমারই অজ্ঞাতে আমাকে মর্মান্তিক আঘাত করবার জন্য তৈরি হচ্ছিল—তা কি আমিই জানতাম!

নইলে হঠাৎ কত বছর পরে আবার আমার অন্তরাত্মার মুখোমুখি হতে হলো কেন ?

আমারও আজ সংসার হয়েছে। আমার প্রকৃত আপনজন বলতে অনেককেই আজ পেয়েছি। কিন্তু সেদিনের সেই ঘটনার পর মনে হয়েছিল—যেন শুধু সুরেশ্বরীদিদিকেই হারাইনি, আমার পরমাত্মীয়কেই হারিয়েছি, সেদিনের সেই বাদাম-তলার সুরেশ্বরীদিদির সঙ্গে সঙ্গে যেন আমার পরমাত্মীয়েরও মৃত্যু হয়েছে। সুরেশ্বরীদিদির বাড়ি থেকে ফিরে এসেছিলাম অনেক রাত্রে। বিপিনদার বাড়ির পাশ দিয়েই আসতে হয়।

বাড়ির সামনে আসতেই থমকে দাঁড়ালাম। ভাবলাম বিপিনদাকে ডাকি। ডেকে সব কথা বলি। বিপিনদা কি জানে? সুরেশ্বরী-দিদির পরিবর্তনের কি খবর রাখে বিপিনদা? ইস্কুলে যাবার সময় দেখি বিপিনদা হাতে ছাতা নিয়ে পড়াতে যাচ্ছেন, দেখা হলে পুরনো ছাত্র হিসাবে প্রণাম করি।

বিপিনদা বলেন—তোমার মা কেমন আছেন?

বললাম—মা'র অম্বলের অসুখ আর সারবে না—

বেশ হৃষ্টপুষ্ট স্বাস্থ্য। অনেকগুলি ছেলে-মেয়েও হয়েছে দ্বিতীয় পক্ষে। আজো বোধহয় ইস্কুলের নতুন ছাত্রদের সেই একই অঙ্ক, একই ভূগোল, একই ইতিহাস শেখান। কিন্তু বিপিনদাই কি জানে তার নিজের জীবনের সব অঙ্ক, সব ভূগোল, সব ইতিহাস আমূল বদলে গিয়েছে!

আর মনে হয় সেই সাধুবাবার সঙ্গে যদি আবার দেখা হয়। ফটিক কাকার প্রথম নাতির দু'হাতে ছ'টা করে বারোটা আঙুল হয়েছিল। আরো হয়তো কয়েকজনের বেলায় তার ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হয়েছিল, কিন্তু সুরেশ্বরীদিদির বেলাতেই বা তা এত মর্মান্তিকভাবে সত্যি হলো কেন? তার ভবিষ্যদ্বাণী না ফললে কার কী এমন মহা ক্ষতি হতো?

যাক্, তখন সান্ত্বনা ছিল এইটুকু যে পরমাত্মীয়ের মৃত্যু হয় হোক, আমার তো অন্তরাত্মা আছে, আমার তো পরমাত্মা আছে। তোমরা জানো আমার চাওয়া পাওয়ার কিছু বাকি নেই জীবনে। আমার বাড়ি, গাড়ি, অর্থ, প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি—যা সংসারী মানুষে চায় সবই আমি পেয়েছি। তোমাদের চোখে কিছুই আমার পেতে বাকি নেই। আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার নাতি, নাতনী তারাও সব আজ বড় হয়েছে, তাদেরও প্রতিষ্ঠা হয়েছে। বটুক মিত্তিরের নাম করলে আজ কেউ চিনতে পারুক আর না-পারুক আমার নাম করলে সবাই চিনতে পারবে। কেমন করে এ-সব ঐশ্বর্য হয়েছে তাও তোমরা জানো। আমি নীরবে পরিশ্রম করেছি দিন রাত, তা সবাই দেখেছে, সবাই জানে। কিন্তু আমার বাইরের এই ঐশ্বর্য আর জলুশের ছবিটা ঠিক যতখানি প্রকট, আমার অন্তরের দৈন্যের ইতিহাসটা ঠিক ততখানিই গোপন। নিজের সেই দৈন্যের দিকটা এতদিন কাউকেই বলিনি,

এতদিন কেউই জানতো না! তা তোমরা এতদিন ধরে রোজ আসছো, রোজ এসে এত গল্প শুনছো, এ-সব গল্প তোমাদেরও কখনও বলিওনি। শুধু তোমাদের কেন, এ দৈন্যের কথা বুঝি কাউকে বলাও যায় না। এমন কি নিজের স্ত্রীকেও বলা যায় না বুঝি! এতদিন যদি না বলে থাকি তো আজকেই বা বলছি কেন?

এই দেখো না, ভাবছি সবই তো বদলে গেল। বাদামতলা বললে আজ আর কেউ চিনতে পারে না। বাদামতলা কখন আলিপুর হয়েছে টেরই পাইনি। আর গোয়ালটুলি! গোয়ালটুলিই কখন যে টার্ফ্ রোড নাম নিয়েছে তাও তো টের পাইনি। একদিন আমাকেও লোকে ভুলে যাবে! তাই আজ মনে হচ্ছে আমাকে যারা জানে, আমাকে যারা জেনেছে, তারা এবার আমার সবটুকুই জানুক। আমার ঐশ্বর্যটাকেই জেনেছে, এবার আমার দৈন্যটুকুও জানুক!

তা তারপরেরটুকু শোনো।

যখন বড় হয়ে পোড়াবাজারের পাশ দিয়ে ট্রামে করে গিয়েছি—ওই দিকে চেয়ে, ওই হরিণবাড়ির জেল ওই পোড়াবাজার, ওই সব দেখতে দেখতে আমার অনেকদিন সেই সব মুহূর্তগুলোর কথা বার বার মনে পড়েছে। ট্রামের আর সব লোক, কেউ আপিস যাচ্ছে, কেউ বসে বসে নভেল পড়ছে, আর আমি ততক্ষণ এই ইট পাথর কাঠ লোহা সব ছাড়িয়ে চলে গিয়েছি সেই সব দিনে, সেই সব বয়েসে, যখন মুহূর্তগুলো ছিল মূল্যবান, দিনগুলো ছিল সোনার। কিন্তু কেবল মনে হতো—আমার তো সব ঘটনাই মনে আছে, কিন্তু মিনির? মিনিরও কি মনে পড়ে? মনে হতো ঠিকানাটা যোগাড় করে ছুটে যাই মিনির শ্বশুরবাড়িতে। গিয়ে আবার ডেকে নিয়ে আসি এখানে। এখানে এনে জিজ্ঞেস করি—এখনও মনে আছে তোর সেই সব দিনের কথা?

বাদামতলাও বদলে গিয়েছে আজ। গোয়ালটুলিও আজ বদলে গিয়েছে। সে-গোয়ালটুলি আর এখন সে রকম নেই, হাজরা ডাক্তারবাবুর সেই ডাক্তারখানাও নেই সেখানে। আর মামারবাড়ি? বাঘা-মামা দিন রাত ফোঁস ফোঁস করতো যে-বাড়ির জন্যে, সেই বাড়িটাই শেষে শ্যামবাজারের কোন্ এক লোকের হাতে পড়লো। বারো হাজার টাকা কেন, বারোটা আধলাও শেষ পর্যন্ত…

কিন্তু বৈষ্ণবদাস সিংহীরও তো পড়ে-পাওয়া টাকা। হঠাৎ কবে ছিয়াত্তুরে মন্বন্তরের হিড়িকে মামাদের পূর্বপুরুষ একরাশ টাকা পেয়ে গিয়েছিল, তার যে এ-পরিণতি হবে তা যেমন অস্বাভাবিক নয় তেমনি অসম্ভবও নয়। এখনও গোয়ালটুলির ওদিকে গেলে দেখতে পাই সেই মেথরদের শূয়োরের পালও নেই সেখানে, আর গরুর খাটালগুলোও নেই, ওখানে চারদিকে বাড়ি উঠেছে ছোট বড় মাঝারি মাপের। এখন আর মোড় থেকে গঙ্গার জল নজরে পড়ে না। গঙ্গা যে গঙ্গা, সে-ও যেন দেখে শুনে কিছু চুপসে এসেছে। রাস্তায় গলিতে পিচ বাঁধানো হয়েছে। মামারবাড়ির সামনে যে নিচু পোড়ো জমিটা ছিল, তাও ভরাট হয়ে পাকা কোঠা বাড়ি উঠেছে। ফ্ল্যাট বাড়ি। তার খোপে খোপে মানুষের বাসা গড়ে উঠেছে—কিন্তু দেখলাম দুটো জিনিষ আজো অক্ষয় অব্যয় হয়ে তেমনি বিরাজ করছে। এক মামারবাড়িটা আর সেই শনি-ঠাকুরের মন্দিরটা।

এসব ইতিহাস হয়তো এমনিই একদিন আমারও মন থেকে মুছে যেত। যেমন কত জিনিসই ভুলে গিয়েছি, তেমনি করে এ-সব ঘটনাও একদিন হয়তো ভুলেই যেতাম! কিন্তু ভোলা গেল না। জীবনের আর জীবিকার তাগিদে যখন কলকাতার বাইরে বাইরে দৌড়-ঝাঁপ করে বেড়াচ্ছি—কোথায় বাদামতলা, কোথায় গোয়ালটুলি আর কোথায় সেই মানুষগুলো কিছুই ঠিক নেই—তখনই আবার বড় অপ্রত্যাশিতভাবে সন্ধান পেলাম মিনির।

জব্বলপুরের রেস্ট হাউসে দু'দিনের জন্যে আস্তানা গেড়েছিলাম। কাজ কর্ম হয়ে গিয়েছিল। পরের দিন যাওয়া ঠিক। ইজিচেয়ারটা বাইরে বাগানের সামনে টেনে এনে বিশ্রাম করছি। হঠাৎ মোট-ঘাট নিয়ে এক বাঙালী ভদ্রলোককে ঢুকতে দেখলাম। প্রথমে তেমন আগ্রহ দেখাইনি। এমন রাস্তায় ঘাটে কত বিচিত্র জায়গায় বিদেশের পটভূমিকায় কত বিচিত্র বাঙালীকে দেখেছি। সব সময় পরিচয় করিনি। কিন্তু ভদ্রলোক পোষাক বদলে বাইরে এসে নিজেই আলাপ করলেন।

বললেন—আপনি তো বাঙালী, কোথায় বাড়ি আপনার?

বললাম—কলকাতায়।

ভদ্রলোক তবু দমলেন না। বললেন—কলকাতার কোথায়?

বললাম—বাদামতলায়, আপনার ?

ভদ্রলোক বললেন—গোয়ালটুলিতে !

গোয়ালটুলি ! আকাশ মাটি সব যেন এক নিমেষে কেমন ওলট-পালোট হয়ে গেল। জীবনে হয়তো এমন একটা সময় সকলেরই আসে যখন কোনও পরিচিত নাম, কোনও পরিচিত স্থান, কোনও পরিচিত লোকের কথা কানে এলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সব একাকার হয়ে যায়। তখন অত্যন্ত অপরিচিত মানুষকেও নিতান্ত ঘনিষ্ঠ বলে মনে হয় ! আমারও তাই হলো। যেন একান্ত আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে, এমনি করে তার দিকে চাইলাম।

ভদ্রলোক পাশে বসলেন।

বললাম—আপনি গোয়ালটুলিতে থাকেন ?

গোয়ালটুলির নাম শুনে আমি এতখানি বিচলিত হবো হয়তো তিনি তা ভাবতে পারেননি। বললেন—হ্যাঁ, কিন্তু আপনি গিয়েছেন নাকি ওদিকে ?

বললাম—গোয়ালটুলিতে আমার মামারবাড়ি !

—মামারবাড়ি ? কোন বাড়িটা ?

বললাম—সিংহী বাড়ি। আমার মামা এখন আর নেই, শ্যাম-বাজারের কোন্ এক লোক কিনে নিয়েছে।

ভদ্রলোক বললেন—জানি, এখন ভেঙে ভেঙে পড়ছে, কেউ সারায়ও না, শুনেছি মামলা করেছে সরিকে সরিকে—। হাজরা ডাক্তারবাবুর পাশের বাড়িটাই তো—

আরো অবাক হলাম, একটা রোমাঞ্চ হলো সমস্ত শরীরে।

বললাম—আপনি হাজরা ডাক্তারবাবুকেও চিনতেন নাকি ?

ভদ্রলোক বললেন—খুব চিনি, চিনবো না ? তাঁর এক মেয়ে ছিল, একমাত্র মেয়ে—কী যেন নাম…

মুখ দিয়ে বহুদিন পরে নামটা নিজের অজ্ঞাতেই বেরিয়ে গেল—মিনি—

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন—তার বিয়ের দিন সে এক কাণ্ড—

বিয়ের দিন সত্যিই এক কাণ্ড হয়েছিল। তখন বড় হয়েছি। দিদিমা তখনও বেঁচে আছে। সারা গোয়ালটুলিটা গাড়িতে ভরে গিয়েছে। হাজরা ডাক্তারবাবুর একমাত্র মেয়ে। বৌবাজারের এক পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হবে। শ্রাবণ মাস। সকাল থেকে তেমন

বৃষ্টির বিশেষ কোনও লক্ষণ ছিল না। হঠাৎ বিকেল থেকে সে কী বৃষ্টি! আমি মা বাবা সকালবেলাই মামারবাড়ি গিয়ে হাজির হয়েছি। আমাদেরও নেমন্তন্ন হয়েছে। মিনির বিয়ে হবে! বর আসবে। মিনি শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে। সকাল থেকেই বহু কথা মনে পড়ছিল। মনে হচ্ছিল সবাই যদি জানতে পারে। অন্তত: বরপক্ষের কানে যদি কথাটা একবার যায়! কেউ বিশেষ জানে না। জানে শুধু কয়েকজন লোক। আর জানি আমি আর কানাই! যদি সে-খবর জানতে পারে এ-বিয়ে ভেঙে যাবে! তখন? মামারবাড়ির ছাদে উঠে মিনিদের বাড়ির ছাদের ম্যারাপ বাঁধা দেখছিলাম। ও-বাড়ি হতে সকাল থেকেই মাছ-মাংস রান্নার গন্ধ আসছে। ম্যারাপের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখছিলাম যদি ও-দিকে ভেতরে কাউকে দেখা যায়। ভেতরে অনেক লোক এসেছে। অনেক আত্মীয়স্বজন। অনেক কম বয়েসী, বেশি বয়েসী, মাঝ বয়েসী মেয়ে। বাড়িতে আজ অনেক মেয়ের ভীড়! এত আত্মীয়স্বজন কোথায় ছিল এদের, এতদিন তো দেখিনি! হঠাৎ চিড়িয়াখানার ওদিকে আকাশের কোণ থেকে যেন কালো একটা মেঘ দৌড়তে দৌড়তে এল আমাদেরই বাড়ির দিকে। আর সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে উপর্ঝরণ বৃষ্টি এসে পড়লো ওদের ম্যারাপের ওপর, আমাদের ছাদের ওপর আর সারা গোয়ালটুলির ওপর। বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা লেগে তেরপলের ওপর পট্ পট্ শব্দ হতে লাগল। প্রথমে বড় বড় ফোঁটা, তারপর সে-ফোঁটাগুলো ছোট হয়ে গেল, কিন্তু তেজে বেগে তারা বাড়লো। গোয়ালটুলির রাস্তার দু'ধারের নর্দমা দিয়ে সোঁ সোঁ করে জলের তোড় বইতে লাগল। বেলা হলে সেই তোড় আরও বাড়লো। ক্রমে জল দাঁড়িয়ে গেল রাস্তায়। গঙ্গার জল ছিল টইটম্বুর—গঙ্গার জলে রাস্তার জল গিয়ে পড়তে পারলো না। বৃষ্টির আর শেষ নেই, অন্ত নেই। আমি মামারবাড়ির খড়খড়ি খুলে দেখতে লাগলাম। বৃষ্টির ছাট ভেতরে এসে গায়ে লাগতে লাগল।

তারপর যখন বর আসবার সময় হলো তখন গোয়ালটুলির মোড়ে একবুক জল। কোনও বরযাত্রী আসেনি, আসতে পারেনি। শুধু বরকর্তা বরকে নিয়ে গাড়ি করে এসে আটকে রইল গোয়াল-টুলির মোড়ে। ছুটোছুটি, হাঁক ডাক পড়ে গেল ডাক্তারবাবুর

বাড়িতে। ডাক্তারবাবু কিছু লোকজন আর কয়েকটা ছাতা নিয়ে দৌড়ে গেলেন মোড়ের দিকে। বরযাত্রী কেউ আসতে পারুক আর না পারুক, বরকে যে-কোনও রকমে আনতেই হবে। সারা ভবানীপুর তখন প্রায় ভেসে গিয়েছে। পুরনো বাড়িগুলোর ভেতরে পর্যন্ত জল ঢুকে পড়েছে। কয়েকটা পুকুর থেকে বড় বড় মাছ ভেসে উঠেছে রাস্তায়। শনি-ঠাকুরের মন্দিরের ভেতরেই একটা রুইমাছ পরদিন সকাল পর্যন্ত আটকে পড়ে ছিল। ঠাকুরের সিংহাসনের ওপর লাফিয়ে পড়ে ছটফট্ করছিল।

তা যা হোক, সেই বর যখন চাকরের কোলে চড়ে বিয়েবাড়িতে এসে নামলো তখন দেখেছিলাম—বেশ দেখতে পাত্রকে। সমস্ত শরীর জলে ভিজে গিয়েছে। বৃষ্টি তখনও পড়ছে। কেউ আসতে পারুক আর না পারুক, বিয়ে তা বলে আটকে থাকতে পারে না। তখন সেই বরকে আবার নতুন শুকনো জামা-কাপড় পরিয়ে সাজানোর পালা। আমার মা সাজাতে লাগল বরকে। বেশ ভালো করে গামছা দিয়ে গা পা মুছিয়ে পাঞ্জাবি পরানো হলো। মুখে পাউডার ঘষে চুল আঁচড়ে আবার বর সাজানো হলো—তারপর রোয়াকের ওপর চারদিকে কলাগাছ রেখে বরণ হলো। পিঁড়ি করে মিনিকে নিয়ে এল সবাই ধরাধরি করে। তারপর ঘোরাতে লাগল চারপাশে। একবার নয়—সাতবার, সাত পাক। সাত পাকের বাঁধন দিয়ে না বাঁধলে যদি খুলে যায় বন্ধন। যদি জানতে পারে, যদি জানাজানি হয়ে যায়! আমি তখন একদৃষ্টে চেয়ে আছি বরের দিকে নয়, মিনির দিকে। ফরসা আঙুলে তিন চারটে আংটি পরেছে। লাল বেনারসী পরেছে। পিঁড়ির ওপর পা মুড়ে বসে আছে। দু'হাতে মুখ ঢেকে আছে—কোনও দিকে দৃষ্টি নেই। মুখ ঢেকেছে লজ্জায় না অনুষ্ঠানের নিয়ম অনুসারে কে জানে? মাথার চুলে সোনার ফুল, রুপোর কাঁটা। আমি একদৃষ্টে দেখছি শুধু।

কে একজন বললে—গুনছো তো ঠিক? ক'পাক হলো হে?

একজন বললে—এই তিন পাক হলো—এই চার···

আমি কিন্তু গুনছি না। আমি দেখছিলাম তার মুখের দিকে চেয়ে। একদিন মুখে যে চড় মেরেছিলাম মিনিকে, সে চড়ের দাগ কি আছে এখনও?

সত্যিই একদিন চড় মেরেছিলাম মিনিকে।

তখন সেই বুকের ফোড়াটায় খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। বাবা এলেন। সন্ধ্যেবেলা আপিসের ফেরত বাড়িতে এসেই বললেন—খোকন কেমন আছে?

মা বললে—কাল সারারাত ঘুমোয়নি!

দিদিমা বললে—হাজরা ডাক্তারবাবুকে একবার দেখালে হতো, শেষকালে বিষিয়ে না যায়—

মিনি আসতো আর ফোড়াটায় হাত বোলাতো। কিন্তু তখন হাত বোলালেও লাগে। যদি নখের আঁচড় লেগে যায়! বলতাম—আর হাত দিতে দেবো না তোকে! যদি তুই লাগিয়ে দিস—

মিনি বলতো—বা রে, তোর লাগলে বুঝি আমার কষ্ট হবে না?

বলতাম—তোর ফোড়া হলে বুঝতিস্ কত কষ্ট হচ্ছে আমার—

মিনি বলতো—আমার ফোড়া না হলেও আমি বুঝতে পারি—

—ছাই বুঝতে পারিস!

মিনি বলতো—তোর সত্যি খুব কষ্ট হচ্ছে, না রে?

বলতাম—খুব কষ্ট হচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন কেউ ছুঁচ ফুটিয়ে দিচ্ছে—

মিনি বললে—বাবার কাছে একটা ওষুধ আছে, সেইটে দিলে ব্যথা সেরে যায়, এনে দেবো?

বললাম—যদি তোর বাবা জানতে পারে, কিছু বলবে না?

মিনি বললে—বাবা জানতে পারলে তো? বাবা যখন থাকবে না, কম্পাউণ্ডারবাবু যখন খেতে চলে যাবে তখন নিয়ে আসবো, কেউ দেখতে পাবে না।

পরের দিন মিনি এল। বললে—চাবিটা খুঁজে পাচ্ছি না, আলমারির ভেতরে চাবি দিয়ে রেখেছে বাবা—

বললাম—তা হলে কি হবে?

—কালকে যখন কম্পাউণ্ডারবাবু চাবি রেখে পাশের ঘরে হাত ধুতে যাবে, আমি চাবিটা চুরি করে রাখবো।

সত্যিই তাই করেই ওষুধ আনলো মিনি, কেউ কোথাও নেই, মিনি চুপিচুপি ঘরে ঢুকেছে। একলা-একলা শুয়েছিলাম। তখনও ভালো করে সন্ধ্যে হয়নি। দিদিমা আর মা দু'জনেই রান্নাঘরে। হঠাৎ কার পায়ের শব্দে চমকে উঠেছি। বললাম—কে রে?

মিনি তার ফ্রকের ভেতরে লুকিয়ে কী যেন এনেছে হাতে করে। বললে—চুপ কর—

তারপর কাছে এসে বললে—এনেছি ওষুধটা—

বললাম—দেখি ?

মিনি তার হাতটা বাইরে বার করতেই দেখি একটা ছোট মতন হলদে কাচের শিশি। শিশির মুখটা ছিপি আঁটা।

মিনি বললে—কেউ দেখতে পায়নি, বাবা বাড়ির ভেতরে চা খেতে গিয়েছে, আর কম্পাউণ্ডারবাবুও সাবান দিয়ে কলে হাত ধুচ্ছিল—আমি টপ করে আলমারি থেকে বের করে নিয়ে এসেছি—

তারপর একটু থেমে বললে—এইটে খেলেই ফোড়া সেরে যাবে তোর—

—তুই কী করে জানলি ?

মিনি বললে—আমি যে সব দেখেছি, বুকে-পেটে খুব ব্যথা হলে কম্পাউণ্ডারবাবু এটা খাইয়ে দেয়—

বললাম—ব্যথা সেরে যাবে ?

—খুব সারবে। না সারলে বাবাকে ওরা অত টাকা দেয় ? বাবার কত টাকা জানিস ? যত লোকের রোগ হয় বাবা সব সারিয়ে দেয়, সেই টাকাগুলো নিয়ে বাবা সব মাকে এনে দেয়, আর মা সেই টাকাগুলো নিয়ে তার ক্যাশবাক্সে রেখে দেয়।

মিনি আমাকে বলেছিল ওদের অনেক টাকা। সমস্ত টাকা মা বাক্সের ভেতরে বন্ধ করে রাখে। যখন মিনির বিয়ে হবে তখন ওই টাকা দিয়ে মিনিকে গয়না গড়িয়ে দেবে।

মিনি বলেছিল একদিন—মা'র মতন আমি সোনার তাগা পরবো, হাতে ছ'গাছা করে চুড়ি পরবো আমার বিয়ের সময়—

জিজ্ঞেস করতাম—তোর কবে বিয়ে হবে রে ?

মিনি বলতো—এখন কি ? দাঁড়া আগে বড় হই, যখন আমার চুলগুলো খুব বড় হবে, খোঁপা বাঁধবো, তখন আমার বিয়ে হবে—

জিজ্ঞেস করতাম—কার সঙ্গে বিয়ে হবে তোর ?

মিনি বলতো—মা বলেছে রাজপুত্তুরের সঙ্গে, আমি বেনারসী পরে শ্বশুরবাড়ি চলে যাবো—

আমি বলতাম—আমাকে নিয়ে যাবি ভাই ?

মিনি বলতো—তোর মা যদি বকে ? মাকে ছেড়ে যেতে তোর কান্না পাবে না ?

বলতাম—কান্না পাবে কেন ? তোর শ্বশুরবাড়িতে থাকবো, আর বিকেলবেলা ছু'জনে বেড়াতে যাবো আরাম করে—রঘুকে সঙ্গে নেবো না, জানিস, ও কেবল বলে—দিদিমনি দেরি হচ্ছে বাড়ি চলো, ওকে মোটে ভালো লাগে না আমার।

মিনি বলতো—সেই ভালো, কিন্তু যদি রাস্তা ভুলে যাই— ?

বলতাম—তখন তো আমি খুব বড় হয়ে যাবো, আমি তোকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবো—

মিনি বললে—কোন্ দিকে বেড়াবি বল তো ?

বলতাম—সেই জলটুঙির ধারে—

—সেই ভালো, সেই সেদিন যেমন জলের ধারে দাঁড়িয়ে ছু'জনে মুখে-মুখে ঠেকিয়ে জলটুঙির জলের তলায় দেখছিলুম—সেই রকম খেলবি আর একদিন ?

তখন ছোটবেলা। এখন হাসি পায় অবশ্য। কিন্তু তাই তো ভাবি সেদিনের সেই তুচ্ছ ভালোলাগাটুকুও কি একেবারেই মিথ্যে ! ছু'জনের সেই বেড়াতে যাওয়া, একসঙ্গে এক-বিছানায় শুয়ে শুয়ে গল্প বলা, তারও কি কোনও মূল্য নেই জীবনে ! নইলে তারপরে জীবনে কত আনন্দ-বেদনার অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়েছি কতবার, কতবার কত বিষণ্ণ মুহূর্তের চাপে নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে এসেছে, কতবার কত সুখের অসহ্য রোমাঞ্চে আন্দোলিত হয়েছি—কিন্তু সেদিনের সেই ছোটবেলার সে-আনন্দ-দুঃখের সঙ্গে তো তার তুলনা হয়নি ! সেই তুচ্ছ থার্ড ক্লাশ ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে মামার-বাড়ি যাওয়ার সুখের তো তুলনা হয়নি আর ! কিম্বা সেদিনের সেই জলটুঙির ধারে মিনির মুখের সঙ্গে নিজের মুখ মিলিয়ে জলে ছায়া দেখার যে রোমাঞ্চ, সে রোমাঞ্চও তো জীবনে কখনও পাইনি ঠিক তেমন করে। আজও আকাশে কত ঘুড়ি ওড়ে, ঘুড়ি হয়তো কেটেও যায়, কিন্তু সেদিনের ঘুড়ির সঙ্গেও কি আজকের এই ঘুড়ির তুলনা আছে ? সেদিনের সেই বাদামতলা, সেই ভবানীপুর, সেই গোয়ালটুলি, পোড়াবাজার, জলটুঙি, হরিণবাড়ির জেলখানা কি আজ আর তেমনি আছে ? সেই ভবানীপুরের পাশ দিয়ে, পোড়াবাজারের পাশ দিয়ে তো রোজই যাই, কিন্তু তেমন করে

মনকে আর টানে না কেন? সেই রাস্তাতেই আজ ইলেকট্রিক লাইট, ড্রেন, জলের কল কত কি হয়েছে, কত বড় বড় বাড়ি উঠেছে সেখানে, আরো ভালো, আরো সুন্দর, কিন্তু তেমন মোহ তো জাগে না। সেই কানাইদের খড়ের গোলা হয়তো আজো আছে, সেই পচা নর্দমা, শনি-ঠাকুরের ভাঙা মন্দির, মেথরদের বস্তি, গোয়ালটুলিতে যাবার পথে সেই গঙ্গা তো আজো আছে, কিন্তু সেই রোমাঞ্চ তো আর জাগে না তা দেখে। মামারবাড়ির ভাঙা বাড়িটা তো আজো ইট বার করা অকেজো হয়েপড়েআছে। বালি চুন-সুরকি সিমেণ্টও পড়েনি আজ পর্যন্ত তার গায়ে, তবু গরমের ছুটিতে যে-বাড়িতে যাবার জন্যে মনটা ছটফট করতো সারা বছর, সে-বাড়িটা আর তেমন করে আকর্ষণ করে না কেন? যখন একলা বসে বসে ভাবনার কূল হারিয়ে ফেলি, নিঃসঙ্গ ট্রেনের কামরায়, নির্জন দুপুররাত্রে ঘুম না এলে কেন তবে সেই সব কথা মনে পড়ে? সেই অতীতে ফেলে আসা দিনগুলোর কথা? সামনের বর্তমান আর অদূরের ভবিষ্যৎ যখন চোখের সামনে অস্পষ্ট হয়ে যায়, কিম্বা ঝাপসা দেখি, যখন সংসারের সুখ-দুঃখের ভিড়ে পালাবার পথ খুঁজে পাই না, তখন কেন বাদামতলা আর গোয়ালটুলির দিনগুলোতে ফিরে গিয়ে শান্তি পাই? আর তখনই কি শান্তি ছিল? তখনই কি সুখ ছিল? তাও তো না। তখনও তো সুরেশ্বরীদিদিকে কিছুদিন না দেখতে পেলে সংসার অন্ধকার হয়ে আসতো। কিম্বা মামারবাড়ি গিয়ে মিনির মুখ ভার দেখলে রাত্রে ভাত খেতে পারতাম না। মিনি ভালো করে কথা না বললে তাতে আমার কি আসতো যেত? গোয়ালটুলির মিনি আমার কে? বাদামতলার সুরেশ্বরীদিদিই বা আমার কে? কেউই নয়। আকাশ, গাছ, রাস্তা, গঙ্গা, পাখীরা যেমন, তারাও তো তেমনি। তবু মিনি যেদিন আড়ি করে দিতো সামান্য কারণে মনে হতো আমার সব হারিয়ে গিয়েছে, আমি নিঃস্ব, আমি সর্বস্বান্ত! ঘোড়ার গাড়িটা যখন গিয়ে পৌঁছোবে গোয়ালটুলির গলির ভেতর, তখন থেকেই আমার চোখ দুটো সজাগ হয়ে উঠেছে, কান দুটো খাড়া হয়ে উঠেছে। ওই মেথরদের বস্তি, ওই চাউলপটি, ওই লালপানা বাড়িটা, ওই শনি-ঠাকুরের ভাঙা মন্দিরটা, ওই রাস্তাটা বেঁকেছে। এইবার দেখা যাবে গঙ্গার জল, ওপারে চিড়িয়াখানার

মাথায় বড় বড় দৈত্যের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো কালো-কালো গাছগুলো, আর এপারে গঞ্জ, চাল আর সুরকি, আর খড়, আর ইট আর নুনের গোলা। বড় বড় টিনের চাল, গদিবাড়ি আর গলির ওপর একে একে নারাণ সাধুখাঁর মুদিখানা, বঙ্কুর সাইকেল মেরামতের দোকান, পচা স্যাকরার সোনারুপোর দোকান, মোষ আর গরুর খাটাল আর তারই পাশপাশি বামুন কায়েত আর কৈবর্তদের বসতবাড়ি সার সার সাজানো। দেখেই কেমন বুকটা নেচে উঠতো! ওই তো হাজরা ডাক্তারবাবুর ডাক্তারখানা, ওর ভেতরেই মিনি থাকে। গাড়িটা ঘড় ঘড় করে আওয়াজ করছে। আওয়াজ শুনেই হয়তো দৌড়ে আসবে মিনি। বলবে—কি রে এসেছিস তুই ?

আমি বলবো—তুই বুঝি ভাবছিলি আমার কথা ?

মিনি বলবে—দূর, তোর কথা ভাববো কেন, আমি তো পুতুলকে চান করাচ্ছিলুম—

শুনে আমার মন খারাপ হয়ে যাবে। আমি বলবো—আর আসবো না মামারবাড়িতে !

মিনি বলবে—কেন রে ?

আমি বলবো—আমার বুঝি রাগ হয় না ? তুই কেন কানাই-এর সঙ্গে ভাব করেছিস ?

মিনি বলবে—এবার তোর সঙ্গে ভাব করবো—

আমি বলতাম—তুই ডাব নিবি না গাড়ি নিবি !

মিনি বলতো—ডাব—

সে আমার কি আনন্দ ! ভাব ! ভাব ! ভাব ! আগের বারে দেখেছিলাম কানাই-এর সঙ্গে মিনির খুব ভাব। দেখি মিনিদের বাড়িতে মিনির পুতুলের সঙ্গে কানাই-এর পুতুলের বিয়ে হচ্ছে। আমি যেতেই মিনি বলেছিল—আয় রে তোর নেমন্তন্ন—

কানাইদের মস্ত বড় একটা খড়ের গোলা ছিল। আমাদের বাড়ির ছাদ থেকে আমরা লাফিয়ে পড়তুম কানাইদের খড়ের গাদার ওপর। ধুপ ধুপ করে আমরা ঝাঁপ দিতুম খড়ের তাড়ার ওপর আর গড় গড় করে গড়িয়ে পড়তুম। সেইখানেই আলাপ। আমি মামারবাড়িতে যেতুম একমাসের জন্যে, আবার ফিরে আসতুম বাদামতলায়। কয়েকদিনের জন্যে বাঁধা খেলাঘর

পড়ে থাকতো গোয়ালটুলিতে ! বাবা আসতো একখানা ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে। মা দিদিমাকে প্রণাম করতো পায়ে হাত দিয়ে। মা'র দেখাদেখি আমিও তাড়াতাড়ি পায়ে হাত দিতাম। দিদিমা চিবুকে হাত দিয়ে চুমু খেতো। বলতো—বেঁচে বর্তে থাকো লক্ষ্মীমন্ত হও বাবা—

তা লক্ষ্মীমন্ত হওয়া হয়েছে আমার। আজ দিদিমা বেঁচে থাকলে তাকে বলতাম—লক্ষ্মীমন্ত হওয়ার আশীর্বাদ তোমার সফল হয়েছে দিদিমা। চুরি জোচ্চোরি না করেও লক্ষ্মীমন্ত হয়েছি। বাঘা-মামার দুঃখে দিদিমা যেমন সারাজীবন চোখের জল ফেলেছে, আমাকে দেখেও আনন্দে হয়তো তেমনি চোখের জল ফেলতো। বাঘা-মামা শেষ জীবনটায় বড় কষ্ট দিয়েছিল দিদিমাকে। সেই গোয়ালটুলির বৈষ্ণবদাসের বংশধর, একমাত্র কুলতিলক একদিন যে শুধু বংশের নামই ডুবিয়েছিল তাই নয়, দিদিমাকেও ডুবিয়েছিল, নিজেও সেই ভরাডুবিতে ডুবেছিল শেষ পর্যন্ত !

বাঘা-মামার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হতো। মুখে কী সব ব্রণের মতো বেরিয়েছে। ছেঁড়া পাঞ্জাবি, ছেঁড়া কাপড়, ছেঁড়া চটি পরে ফটাস্ ফটাস্ করে রাস্তা দিয়ে যেতে দেখেছি কতবার। আমাকে দেখতে পেয়েই কাছে এসেছে। বলেছে—এই একটা বিড়ি দে না—

বলতাম—বিড়ি খাই না—

—মাইরি আর কি, বিড়ি খাস না। তা হলে গাঁজা ধরেছিস বুঝি ? দেখি, দাঁত দেখি ?

অথচ বৈষ্ণবদাস সিংহী ছিলেন সদালাপী, সদাচারী, মিতাহারী লোক। সকাল বেলা আহ্নিক না করে জল গ্রহণ করতেন না। যখন এই ভবানীপুর এমন ছিল না, ওই সাহাদের বাড়ি ছিল না, কানাইদের খড়ের গোলাও ছিল না, ওই গঙ্গা মস্ত বড় ছিল, মস্ত চওড়া ছিল, হাজার মণি, দু'হাজার মণি নৌকো এসে ভিড়তো ওই গোয়ালটুলির ঘাটে, তখন তাঁর নাম-ডাক ছিল, সাহেব-সুবোরা লাটবেলাটরা তাঁকে খাতির করতো। এই গলির মোড়েই একদিন ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেবের পাল্কী এসে থেমেছিল—এই ঘাটের কাছে, বৈষ্ণবদাস সিংহীর চালের আড়তের দরজায়। সাহেব বৈষ্ণবদাস সিংহীর হাতে হাত দিয়েছিল। বলেছিল—তুমি ক্যালকাটাকে বাঁচিয়ে দিয়েছ বৈষ্ণবদাস—

তা সত্যিই বাঁচিয়েছিলেন তিনি! লাটসাহেব সেদিন সবাইকে ডেকেছে দরবারে। সবাই হাজির। বৈষ্ণবদাস সিংহী খালি পায়ে, গায়ে একটা উড়ুনি চড়িয়ে ঘরের এককোণে বসে মালা জপছেন।

লাটসাহেব এক একজনকে জিজ্ঞেস করছেন—তোমার আড়তে কত চাল আছে?

—আড়াই হাজার মণ।

—তোমার আড়তে?

—ন' হাজার মণ।

—তোমার আড়তে?

সকলের শেষে বৈষ্ণবদাস সিংহীর পালা। ভয়ে তাঁর বুক কাঁপছে। হাতের মালা হাতেই থেমে আছে। কী বলতে কী বলে ফেলবেন। হয়তো সব চাল আড়ত খুলে তুলে নিয়ে যাবে কোম্পানীর পল্টনরা। গাঁয়ে মানুষজন না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে, শুকনো পাতা খাচ্ছে গাছের। কোলের ছেলে বিক্রি করে দিচ্ছে। গাছের ডালে ঝুলে পড়ে আত্মঘাতী হচ্ছে। সব খবর কানে এসেছে বৈষ্ণবদাস সিংহীর। এ-সময় তার মজুত চালের হিসেব লাটসাহেবের কানে গেলে পল্টনরা ছেড়ে দেবে!

—তোমার আড়তে কত চাল আছে?

বৈষ্ণবদাসের যেন তন্দ্রা ভাঙলো। কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—হুজুর, সতেরো হাজার মণ!

—কত? সাহেবের যেন বিশ্বাস হলো না।

—আজ্ঞে, সতেরো হাজার মণ!

হাসি বেরোলো সাহেবের মুখ দিয়ে। বৃথাই ভাবছিল সাহেব। সারা কলকাতা খেয়ে বাঁচবে—আর ভয় নেই! লাটসাহেব চেয়ার ছেড়ে সোজা চলে এল কাছে। ভালো করে দেখলে মানুষটাকে খালি গা, খালি পা, হাতে জপের মালা—। সাহেব হাত ধরে বৈষ্ণবদাসকে টেনে আনলে নিজের চেয়ারের কাছে। টেবিলের ওপর ছিল আপেল কমলালেবু আরো সব অনেক ফল

সাহেব বললে—তোমার চাল আমি সব কিনে নিলাম বৈষ্ণবদাস—ডবল দাম দিয়ে—

সাহেব ডবল দাম দিয়েই কিনে নিলে সেই সতেরো হাজার

মণ চাল। পল্টনরা চাল নিয়ে গিয়ে কেল্লায় তুললে। ছুটো মাসের ভয় ছিল লাটসাহেবের। শুধু দু'মাস চালাতে পারলেই কলকাতায় ছিয়াত্তুরে মন্বন্তরকে ঠেকানো যাবে। সেই ভাবনা চুকে গেল। ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেব নিজে পাল্কি চড়ে এসে টাকা গুনে দিয়ে গেল বৈষ্ণবদাসকে। আর তারপরেই এই বাড়ি হলো, এই জমি জমা যা কিছু!

সেই বৈষ্ণবদাস সিংহীর বংশের ধারা বইতে বইতে যখন বিংশ শতকের গোড়ায় এসে পৌঁছলো, তখন জন্মালো বাঘা-মামা। বংশের একমাত্র কুলতিলক। দিদিমা বললে—লেখা পড়া তোর করতে হবে না বাবা, বাড়ি রইল, টাকা রইল, দেখে শুনে চলতে পারলে তোর ভাবনা কী?

তারপর বয়েস হতেই টাকা কড়ি, ঘটি বাটি চুরি হতে লাগল।

মা বললে—দাদার একটা বিয়ে দিলে না কেন মা?

দিদিমা বলতো—ওকে কে মেয়ে দেবে বল্ তো খুকি, বিয়ে দিয়ে কি আমি খুনের দায়ে দায়ী হবো—

সেই বাঘা-মামাই একদিন রাত্রে যখন সবাই ঘুমিয়েছে, হঠাৎ উধাও। সন্ধ্যেবেলাও কেউ টের পায়নি। যেমন অনেক রাত্রে নেশাভাঙ করে আসে, তেমনি সেদিনও এসেছে, দিদিমা সদরদরজা খুলে দিয়েছে। দিদিমা জিজ্ঞেস করেছে—ভাত ঢাকা আছে খাবি বাঘা?

বাঘা-মামা বলেছে—কী মাছ করেছ আজ?

দিদিমা বলেছে—চিংড়ি—

—দূর, কুচো চিংড়ি খেয়ে নেশা মাটি করছি আমি!

বলে যথাস্থানে শুয়েও পড়েছে। হঠাৎ রাত্রে দিদিমার যেন কী একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গিয়েছে। বেড়াল নাকি? হয়তো রান্নাঘরে মাছের গন্ধে হাঁড়ি ঠেলছে। আবার সেই শব্দটা! দিদিমা কাঁথাটা সরিয়ে উঠলো। হয়তো হুড়কোটা খোলা আছে, ভালো করে আঁটেনি। হঠাৎ উঠোন পার হতে গিয়ে কী যেন পায়ে ঠেকলো—এটা কী রে? ও বাঘা, বাঘা! ঘুমোলি নাকি? ওঠ, চোর পড়েছে বাড়িতে। ও বাঘা!

কা কস্য পরিবেদনা। কেউ কোথাও নেই, ঘরের ভেতর বিছানাটা হাতড়ে হাতড়ে দিদিমা খুঁজলো চারিদিক। হারিকেন

লণ্ঠনটা জ্বাললো। তারপর অবাক হয়ে গেল। বাঘার ঘরের দরজাটা খোলা হাট করা। তারপরের ঘরের তালাটা ঝুলছে। তারপরে দিদিমার শোবার ঘর। দিদিমা গরমের জন্যে নিজের ঘরে তালা দিয়ে খোলা রোয়াকটায় শুয়েছিল। সে-ঘরটার তালাও ভাঙা; তার ভেতরেই দিদিমার যাবতীয় জিনিষ। সিন্দুকের ভেতর দামী দামী বাসন-কোশন, এ-বাড়ির দলিলটা পর্যন্ত। সিন্দুকটার ডালাও খোলা। সিন্দুকের ভেতর হারিকেনটা নিয়ে বার বার দেখছে দিদিমা, দলিলপত্র বাঁধা ছিল একটা কাগজের পুঁটলিতে সেটা নেই, আর সব জিনিষপত্র ছড়ানো রয়েছে ঘরময়, কিছু মেঝেতে কিছু বা রোয়াকে, কয়েকটা উঠোনে।

পাশের হাজরা ডাক্তারবাবুকে খবর দিলে দিদিমা।

কাকীমা এল। দিদিমা বললে—একটা খবর দিতে পারো আমার জামাইকে, বাদামতলায়—

তা এসব ঘটনাও অনেক পরের। তখন আমি বড় হয়েছি। বাবাও বুড়ো হয়েছে। মিনিরও তখন বিয়ে হয়ে গিয়েছে। আমি বরের দিকে সেই বিয়ের দিন বার বার চেয়ে দেখেছিলাম! বেশ চমৎকার স্বাস্থ্য! বরযাত্রী নেই, কেউ নেই, ঝম্ ঝম্ করে কেবল বৃষ্টি আর বৃষ্টিই পড়েছিল বিয়ের দিন। কোথা থেকে এত আত্মীয়-স্বজন লোক-লস্কর এসেছিল! তারাই দিনরাত ঘিরে রইলো বর-কনেকে। মিনির দিকে চেয়ে চেয়ে দেখেছিলাম, কিন্তু কথা বলতে পারিনি। আমার মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন কেবল বর-কনেকে ঘুরে ফিরে। ছোটবেলায় বলেছিলাম মিনির সঙ্গে আমিও তার শ্বশুরবাড়িতে যাবো—সে কথা যদি এখন মনে করিয়ে দিই!

মিনি বলতো—তোকেও আমার শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে যাবো—

আমি বলতাম—সেখানে গিয়ে দু'জনে জলটুঙিতে বেড়াতে আসবো—

সেই সব টুকরো টুকরো কথাই তখন আমার কেবল মনে পড়ছে।

বর বুঝি পরদিন সকালবেলা একবার আমার দিকে চেয়ে দেখলে। বরকর্তা সকালবেলা সেই বৃষ্টির মধ্যেই বাড়ি চলে

গিয়েছে। ঘরে অনেক লোক। মেয়েরা বরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করছে। একপাশে আমি বসে বসে দেখছিলাম।

কে একজন বললে—এ বড় বাদলা-বর ভাই—এসে পর্যন্ত বৃষ্টি পড়ছে, আমোদ-আহ্লাদ কিছু হলো না, মিনির বিয়েতে আমাদের কত সাধ ছিল ফুর্তি করবো—

বর একবার আমার দিকে চাইলে। ঘরের মধ্যে আমিই একমাত্র বড় বয়সের ছেলে।

বললে—ওঁর সঙ্গে তো পরিচয় হলো না ?

আমি কথাটা শুনেই আরো জড়োসড়ো হয়ে গেলাম।

মিনির এক মাসিমা বললে—ও ওই পাশের সিংহীবাড়ির নাতি—ওর একবার কী হয়েছিল জানো ?

বলতেই আমার দিকে সবাই চাইলে। আমার মনে হলো এখান থেকে পালাতে পারলেই যেন বাঁচতাম।

বর জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছিল ?

মিনির মাসিমা বললে—দিদির কাছে শুনেছি, দিদি বলো না তুমি—

কাকীমা ঘরে এসেছিল তখন। বললে—সে অনেক ছোট বেলাকার কথা, মিনি আর একটু হলে ওকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতো, খুব দুষ্টু ছিল তো মিনি—

সত্যিই মরে যেতাম হয়তো সেদিন। মিনির হাতেই মারা যেতাম। আমার ফোড়া হয়েছিল, আর মিনি এনেছিল ওষুধ। বাবার ওষুধের আলমারির চাবি চুরি করে ওষুধের বদলে বিষ এনে দিয়েছিল।

মিনি বলেছিল—এটা খেয়ে নে, সব ব্যথা একেবারে সেরে যাবে—

বললাম—দেখি, ওষুধটা দে আমাকে—

মিনি ফ্রকের তলা থেকে ওষুধটা বের করে আমায় দেখালে। হলদে মতন একটা বেঁটে শিশি। মুখে ছিপি আঁটা।

মিনি আমার হাতে শিশিটা দিয়ে বললে—এটা খেলে আর ফোড়া কাটতে হবে না—খা—খেয়ে নে—

হঠাৎ যেন বজ্রপাত হলো।

—কী খাবে রে ? কী খাওয়াচ্ছিস ওকে ?

দিদিমা হঠাৎ ঘরে ঢুকতেই মিনি শিশিটা ফ্রকের মধ্যে লুকিয়ে ফেলেছে।

—কী লুকোলি রে? দেখি দে, বার কর—

মিনি তখনও দিচ্ছে না। মিনিকে বাঁচাবার জন্যেই বললাম—আমার জন্যে ওষুধ এনেছে মিনি—

—ওষুধ? কীসের ওষুধ?

আমি বললাম—আমার ফোড়ার ওষুধ, একটুখানি খেলেই ফোড়া সেরে যাবে!

দিদিমা চিৎকার করে উঠলো—ও খুকি, দেখে যা, এদিকে কী কাণ্ড! আর একটু হলে ছেলেকে মেরে ফেলতো মা—

মা'ও তখন দৌড়ে এসেছে।

দিদিমা মিনির হাত থেকে তখন ওষুধের শিশিটা কেড়ে নিয়েছে।

বললে—এই দেখ, খোকনকে কী খাওয়াচ্ছিল কে জানে। এ কোত্থেকেই বা পেলে? কোত্থেকে পেলি এ ওষুধ? কে দিলে তোকে?

মিনির চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়ছে।

—বল্, এ ওষুধ তোকে কে দিয়েছে? তোর বাবা দিয়েছে? বল্?

মিনি শুধু বললে—না—

—তবে কে দিলে? তুই নিজে নিজে নিয়ে এসেছিস?

মিনির এই বকুনি-খাওয়া দেখে আমার যেন কান্না পাচ্ছিল।

বললাম—ওকে তোমরা কেন বকছ দিদিমা? ও তো আমার ভালোর জন্যেই ওষুধ এনেছে, বাবার আলমারি খুলে নিয়ে এসেছে, ওকে কেন হেনস্থা করছ?

—শুনেছিস কথা ছেলের। ও যেন ডাক্তার। ওর বাবা ডাক্তার বলে ও-ও কি ডাক্তারি জানে, ডাঁক তো খুকি ওর মাকে, ডেকে আন তো, মেয়ের কাণ্ড দেখুক—

মা ডাকতে গেল কাকীমাকে।

দিদিমা মিনিকে বলতে লাগল—খোকন না ছোট তোমার চেয়ে? তোমার বয়েস হয়েছে, দু'দিন বাদে বিয়ে হবে, শ্বশুরবাড়ি

যাবে, তোমার একটা জ্ঞান নেই! যা তা ওষুধ, জানা নেই শোনা নেই, ওকে খাওয়াচ্ছিলে!

মিনি চুপ করে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল।

দিদিমা বলতে লাগল—এখন যদি এই খেয়ে খোকনের কিছু হতো? তোমার এতটুকু বুদ্ধি হয়নি মা, কী সব্বনাশ করছিলে বলো তো?

কাকীমাও দৌড়ে এল।

দিদিমা বললে—এই দেখ মা, খোকনকে আর একটু হলে এইটে খাইয়ে দিতো—কী জানি মা, এ বিষ না কী—

কাকীমা মিনির কাছে গিয়ে বললে—এ ওষুধ কোথায় পেলি বল্? কে দিলে তোকে শুনি?

এবার হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলো মিনি।

কাকীমা বললে—আবার কান্না হচ্ছে, কি সর্বনেশে মেয়ে মা, উনি শুনলে মেরে-ধরে একসা করবেন। চল—চল শিগগির—

বলে মিনির চুলের মুঠি ধরতেই, মা বললে—থাক ভাই, ডাক্তারবাবুকে আর কিছু বলে দিও না—

—না বলবে না—মেয়ের দেখাচ্ছি মজা—

এবার আরো জোরে কেঁদে উঠলো মিনি। ওষুধের শিশিটা নিয়ে গেল কাকীমা! বাড়িতে যেতেই হাজরা ডাক্তারবাবু শিশি দেখে বললেন···এ কি?···এ যে বিষ···এ কোথায় পেলো ও?

ঈশ্বরের অভিপ্রায় বোধহয় অন্যরকম ছিল। নইলে সেই ওষুধ খেয়েই হয়তো সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণার লাঘব হয়ে যেত আমার চিরকালের মতো। তা হলে হয়তো আর ইনিয়ে-বিনিয়ে এই গল্প বলতে হতো না। হয়তো দেখতে হতো না দিদিমার, মা'র আর বাগা-মামার এই মর্মান্তিক পরিণতি। মিনির সঙ্গেও দেখা হয়ে যে আবার এক অন্য রকম অভিজ্ঞতা হলো তাও হতো না। সমস্ত জীবনটা যে এই দেখার খেসারত দিয়ে যাচ্ছি তাও আর দিতে হতো না। এক-একবার মনে হয় কেন এত দেখি! না দেখলেই, না ভাবলেই হয়। আর পাঁচজন যেমন করে জীবন নিয়ে সুঃখে-দুঃখে কাটিয়ে দেয়, সকালের সূর্যোদয়ের সঙ্গে শুরু করে রাত্রের নিদ্রায় সবটুকু নিঃশেষ করে পূর্ণচ্ছেদ টেনে দেয়, তেমনি

করে আমিও কাটিয়ে দিলে পারতাম। কেন একটা স্মৃতি হাজার স্মৃতির ভগ্নাংশ হয়ে দিনে রাত্রে অহরহ পীড়ন করে। কেন যা পেয়েছি তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারি না, যা পাইনি তার হিসেব নিয়ে দিনের শান্তি আর রাত্রের নিদ্রার ব্যাঘাত করি! আমিই বা পাইনি কম কি? সংসারে সব মানুষ সব কিছু পায় না। কিন্তু পাওয়ার অজস্রতায় আমার অঞ্জলি তো ভরেই উঠেছে! যেমন করে আর পাঁচজনের ভরে উঠেছে তেমনি করেই ভরেছে। তবু ভিক্ষাবৃত্তির যেন শেষ নেই! যেন সেই ভিক্ষাবৃত্তির তাড়নাতেই আবার একদিন যেতে হয়েছিল মিনির কাছে। অনেক কষ্টে ঠিকানা যোগাড় করে কেন আবার মিনির বাড়িতে গেলাম! অন্ধকার গলি রাস্তা। বাড়ির নম্বরগুলো পর্যন্ত ভালো করে দেখা যায় না। সেদিন বর্ষাকাল।

মনে আছে নম্বর আর ঠিকানাটা।

বারোর দুই-এর এফ বলাই সুর বাই-লেন। পকেট থেকে ঠিকানা লেখা কাগজটা আর একবার বার করে দেখে নিয়েছিলাম।

জব্বলপুরের রেস্ট হাউসের ভদ্রলোকটি বলেছিলেন—এই তো ক'মাস আগে খবরের কাগজে বেরিয়েছিল, আপনি পড়েননি?

বললাম—কোন খবরটা বলুন তো?

ভদ্রলোক বলেছিলেন—নিজের মোটর চালিয়ে আপিস থেকে আসছিলেন ভদ্রলোক, পাশ থেকে একটা লরী এসে ধাক্কা দেয়, আর তিনি ছিটকে পড়েন—

উত্তেজিত হয়ে শুনছি আর বুকের ভেতর কেউ যেন হাতুড়ির ঘা মারছে, বললাম—তারপর?

ভদ্রলোক বললেন—ছিটকে পড়ে হয়তো বেঁচে যেতেন, কিন্তু তখন পেছন থেকে একটা বাস এসে তাঁর পায়ের ওপর দিয়ে চলে গিয়েছে—

—তারপর?

ভদ্রলোক বললেন—শুনেছি দুটো পা-ই নাকি কাটতে হয়েছে। অনেকদিন তো কলকাতায় যাই না, খবরের কাগজে ঠিকানাটা দেখে জানতে পারলাম—কখন যে মশাই কার ভাগ্যে কী ঘটে কে বলতে পারে, অথচ বিয়ের সময়ে শুনেছিলুম খুব বড়লোক,

বৌবাজারের মতন জায়গায় খালি জমি, নিজেদের বাড়ি, ব্যাঙ্কে প্রচুর টাকা—দেখুন, সব কোথায় গেল—

অনেকদিন পরে পুরনো মানুষদের খবর পেয়ে যেন স্বস্তি পেলাম। হ্যাঁ স্বস্তিই পেয়েছিলাম বৈ কি! বৈষ্ণবদাস সিংহীদের যত নাম-ধামই থাক, তখন তো সে-বংশের শেষ দশা, আর আমাদের বটুক মিত্তিরদের বংশেরও তখন সেই অবস্থা। যে-বটুক মিত্তিরদের বাড়িতে কাঁচা টাকার লোভে একদিন ডাকাত পড়েছিল সেই বংশেরই বংশধর হয়ে বাবা উদয়াস্ত চাকরি করেছেন, নিজের হাতে বাজার করেছেন। ভাই-ভাইপোরা পর্যন্ত আমাদের আলাদা করে দিয়েছে। আর আমার মা! সেই মাকেও তো বাপের বাড়িতে কখনও রান্নাঘরে ঢুকতে হয়নি। সিংহীদের তখনও কিছু কিছু আয় ছিল। পাশের পোড়ো জমিটা ভাড়া দিয়ে মাসকাবারি টাকা আসতো। কিন্তু ভবানীপুরে তখন নতুন নতুন সমাজ গড়ে উঠেছে! চোখের সামনে দেখা গিয়েছে কোথা থেকে সব লোক এসে এসে বাড়ি করতে শুরু করলো। পুরনো বাসিন্দাদের বাড়ি-গুলো কেউ কেউ কিনে নিলে, আসল বাসিন্দেরা ভাড়া বাড়িতে উঠে গেল। এল সাহারা, এল চক্রবর্তিরা। কেউ নদীয়া, কেউ ফরিদপুর, কেউ বা বারুইপুর থেকে—আবার কেউ শ্যামবাজার বাগবাজার শোভাবাজার থেকে। তাদের চেহারা আলাদা, তাদের লোকজনরা আলাদা, তাদের ছেলেমেয়েদের চেহারা পর্যন্ত আমাদের থেকে আলাদা। আমরা হাঁ করে চেয়ে দেখতাম তাদের দিকে। তাদের বাবা কাকারা গাড়ি করে আপিসে যেত। তাদের মায়েরা নতুন রকম শাড়ি পরে গাড়ি চড়ে থিয়েটার দেখতে যেত—তাদের ছেলে মেয়েরা অন্য রকম ফ্রক শায়া সেমিজ পরতো।

হাজরা ডাক্তারবাবু তাদেরই একজন। দিদিমার বাড়ির পাশের জমিটা কিনে একদিন বাড়ি করলেন। তাদের বাড়ি নতুন, আমাদের বাড়ি পুরনো। তাদের বাড়ির ছাদ ঘেরা, আমার মামারবাড়ির ছাদ নেড়া। তাদের বাড়ির সদরে লোকজন গাড়ি, সব সময় উজ্জ্বল—আমাদের বাড়ির সামনে নোনা ইট-বার করা, সদরের সামনে নির্জন। একটা লোক এলে দরজা খুলে দেবারই লোক নেই। তাদের অবস্থা উঠতি, আমাদের পড়তি।

কি জানি! অন্তত: আমার সেই ছোটবেলাতেও আমি সেই

চোখ দিয়ে দেখতাম। মনে হতো ভবানীপুরটা মিনিদের আর বাদামতলার হাট আর বাদামতলার গঙ্গায় খড়ের নৌকো আমাদের!

এতদিন পরে মিনিদের এই অবস্থা বিপর্যয়ের কথা শুনে আমার কি সহানুভূতি হয়েছিল? দুঃখ হয়েছিল? নিশ্চয় দুঃখ হয়েছিল। মিনির জীবনে সুখ শান্তি ঐশ্বর্য ভরে উঠুক এই-ই তো আমি চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম ওদের অবস্থা আমাদের চেয়ে বরাবরই ভালো ছিল, তা আরো ভালো হোক। আরো সুখী হোক মিনি। যেন সারাজীবন ওর সুখের খবরই শুনি, ওর ঐশ্বর্যের কাহিনীই শুনি! কিন্তু আসলে সত্যিই কি তাই?

মনে আছে সে-দিন যখন কলকাতায় এলাম, প্রথমেই ছুটে গেলাম বৌবাজারে।

খুঁজে খুঁজে বারও করলাম বারোর-দুই-এর এফ, বলাই সুর বাই-লেন। এককালে সমৃদ্ধশালী লোকদের পাড়াই ছিল এ-সব। দোতলা তিনতলা সব বাড়ি। অনেকদিন পরে এসেছি—নিজের পরিচয় দিয়েই চেনাতে হবে। তবু আজ আর সঙ্কোচ হলো না। এখন তো মিনি, মিনির স্বামী আমাদের সমপর্যায়ে নেমে এসেছে। এখন আর লজ্জা করবার অবকাশ নেই। এখন রুগ্ন স্বামীর পরিচর্যায় ব্যস্ত থাকতে হয়, এখন অনেক কাজ মিনির। এখন রাঁধতে হয় নিজেকে, ছেলে-মেয়ে যদি অনেকগুলো হয়ে থাকে তো তাদেরও দেখা শোনা করতে হয়। ধোঁয়া কালি আর বৌবাজারের স্যাঁতসেঁতে বাড়ির বদ্ধ ঘরের মধ্যে ইহজীবন কাটিয়ে দিচ্ছে সেই সেদিনকার জলটুঙির মিনি। হয়তো গাড়িও বেচে দিতে হয়েছে। সব দিন কি মানুষের সমান যায়! এতদিন পরে দেখা হবে, নিজের মনেই সহানুভূতির ভাষাটা রপ্ত করে নিচ্ছিলাম। প্রথমে গিয়েই বলবো—সব শুনেছি, কোনও দুঃখ করো না—সংসারের দাবা খেলায় কেউ কেউ জিতলেও কাউকে তো আবার হারতেও হবে—

আরো বলবো—এই আমাকেই দেখো না—

নিজের চেহারা আর অবস্থাটা দেখাবার জন্যে, অন্ততঃ সান্ত্বনার উদ্দেশ্যেও দেখাবার জন্যে, নেহাত সাদাসিধে একটা লঙক্লথের পাঞ্জাবি আর মোটা ধুতি পরে নিয়েছিলাম। সঙ্গে করে অনেক

জিনিস নিয়ে গিয়েছিলাম। নিউ মার্কেট থেকে ফল, আর জব্বলপুরের কিছু ক্ষীরের খাবার। আর সিল্কের একটা শাড়ি বললে ঠিক বলা হবে না! বিশেষ দামী শাড়িই সেটা।

—ঠিকানা কোথায় পেলে?

বললাম—কলকাতায় ঠিকানা বের করা কি এমন শক্ত?

মিনি হাতের ফলের ঝুড়ি আর শাড়ি মিষ্টিগুলোর দিকে চোখ বুলিয়ে হয়তো বলবে—এগুলো আবার নিয়ে আসতে গেলে কেন?

বলবো—অনেকদিন পরে এলাম, খালি হাতে আসি কী করে?

মিনি হয়তো কাঁদবে! চোখ দুটো ছলছল করে উঠবে।

বলবো—আর তা'ছাড়া, এখানে তো থাকি না, বিদেশের জিনিস সব, তোমার কথা ভেবেই এনেছিলাম—

—জ্যাঠাইমা কেমন আছেন?

বলবো—জ্যাঠাইমার কথা এখনও তোমার মনে আছে?

—মনে নেই? মেয়েরা কিছু ভোলে না!

—তাহলে জলটুঙির কথাও মনে আছে? সেই জলটুঙির জলে ছায়া দেখা?

—আছে।

—বলেছিলাম তোমার সঙ্গে তোমার শ্বশুরবাড়িতে আসবো, আর রোজ বিকেলে জলটুঙিতে বেড়াতে যাবো, ওঃ কী ছেলেমানুষই ছিলুম তখন সব আমরা—

বলে একবার হাসবার চেষ্টা করবো আমি। মিনি হাসবে না। এখন সংসার হয়েছে, গিন্নী হয়েছে, এখন আর তেমন করে হাসলে চলে না তার। আর শুধু সংসার নয়, সংসারের সবটুকু গরল আকণ্ঠ পান করে হয়তো অন্যরকম হয়ে গিয়েছে সে। অত বড় দুর্ঘটনা কেমন করে সহ্য করছে! কেমন করে সারা জীবন সহ্য করবে!

রিক্সাওলাটা বলেছিল—ঔর কেতনা দূর বাবু?

বলেছিলাম—দাঁড়া বাবা, ঠিকানাটা খুঁজে বার করি, এই তো বলাই সুর বাই-লেন—বারোর-দুই-এর এফ বার করতে হবে—

রিক্সার ওপর ফলের ঝুড়ি আর মিষ্টির চ্যাঙারিটা রেখে নিজে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছিলাম। বিকেলের পর আপিস-ফেরতা লোকের ভিড় পুবমুখো চলেছে। নানান সাইজের নানান

রঙের নানান অবস্থার বাড়ি সব। একটা নতুন জমকালো বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

বারোর-ডুই-এর ই! এটা নয়, এর পরেরটা!

পরের বাড়িটা জরাজীর্ণ। একটা গ্যারেজও রয়েছে সামনে। এই বাড়িটাই। বারোর-ডুই-এর এফ। বুকটা কেমন ছুরছুর করে কেঁপে উঠলো বার কয়েক। গ্যারেজের গাড়িটা নতুন। দরজার ফাঁক দিয়ে চেহারাটা দেখা যাচ্ছে। হয়তো এখনও বেচেনি। কে বেচবে। হয়তো কেউ-ই দেখবার নেই।

রিক্সাওলাকে বললাম—এই রোখো রোখো—এই বাড়ি—

সামনের সদরের পৈঁঠেতে একটা ছোট মেয়ে বসে ছিল। আধফরসা ফ্রক। বছর সাত-আট বয়েস হবে। চেয়ে দেখলাম অনেকটা যেন মিনির ছেলেবেলার চেহারার মতন।

এক নিমেষে যেন সমস্ত আমার ভুল হয়ে গেল। সব গোলমাল হয়ে গেল এক মুহূর্তে। আমি যেন সামনে মিনিকেই দেখছি। এই কলকাতা, এই বৌবাজার, এই বলাই স্থর বাই-লেন সমস্ত অতিক্রম করে আর এক জগতে ফিরে গিয়েছি, আর এক যুগে গিয়ে পৌঁছেছি। সেদিনও মিনি ঠিক এমনি করে মুখ ভার করেছিল।

মনে আছে বাবা এলেন সন্ধ্যাবেলা আপিস থেকে।

দিদিমা এসে নালিশ করলে—আজ খোকা শেষ হয়ে যেত, জানো—

—কেন, কী হয়েছিল!

বাবা হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। রোজ ঘুমোতে ঘুমোতে যে-বাবা আমার কথা ভেবে ঘুম থেকে উঠে বসে, তার যেন হঠাৎ এ-কথাটা বিশ্বাস হলো না।

বাবা বললে—ছাদে উঠেছিল বুঝি? আমি পই-পই বারণ করে গিয়েছি ন্যাড়া ছাদে যেন···

দিদিমা বললে—না, ছাদে উঠবে কেন, আমি সেই ঘুড়ি ধরবার পর থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়েছি—আজ আর একটু হলে বিষ খেয়ে খুন হয়ে যেত। তুমি ওকে নিয়ে যাও—ওকে আর এখানে রাখতে পারবো না, কোনদিন কী কাণ্ড করে বসে—

বাবা আমার দিকে চাইলে। বললে—বিষ? বিষ কোথায় পেলে আবার?

—ওই হাজরা ডাক্তারবাবুর মেয়ে, সে বাপের আলমারি থেকে চুরি করে বিষ নিয়ে এসেছে, বলছে—খা, খেয়ে নে, ব্যথা সেরে যাবে! আমি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে কলতলায় যেতে গিয়ে শুনতে পেলাম, কী খেতে বলছে! তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে দেখি ওই কাণ্ড!

বাবা বললে—তা ডাক্তারবাবু কী বললেন শুনে?

দিদিমা বললে—খুব মার খেয়েছে, কিন্তু আমি যদি না দেখতাম কী সব্বনাশ কাণ্ড হতো—আমার বুক তো কাঁপছে কেবল সেই থেকে—

বাবার মুখটা কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। কাছে সরে এল। বললে—দেখি—ফোড়াটা কেমন আছে?

ফোড়াটা দেখে বললে—দেখছি পেকেছে বেশ!

দিদিমা বললে—রাত্তিরে তো ওরই জন্যে ঘুম হয় না—কেবল বলে বড্ড ব্যথা—

দিদিমা চলে যাবার পর মা এল। বললে—একবার ডাক্তারবাবুকে দেখালে হয় না, শেষকালে যদি শোষ হয়ে যায়—

বাবা উঠলো। বললে—দেখি ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে যাব ওকে একবার—যদি কাটতে হয়—

কাটার কথা শুনেই ভয় করতে লাগল। ঝরঝর করে রক্ত পড়বে, যন্ত্রণায় ছটফট্ করবো আর মিনি হাসবে। বললাম—না বাবা, আমি ডাক্তারবাবুর কাছে যাবো না—

বাবা বললেন—না কোনও ভয় নেই, ওষুধ দিয়ে দিলে আর কিছু লাগবে না।

তবু আমার ভয় করতে লাগল।

বাবা বললে—কাল তাহলে আপিসে ছুটি নেবো আমি—সকালবেলা এসেই নিয়ে যাবো ডাক্তারবাবুর কাছে—কী বলো?

মা বললে—সেই ভালো, বড় কষ্ট পাচ্ছে—

কিন্তু কথাটা শুনে পর্যন্ত সারারাত আমার ঘুম হলো না সেদিন। রাত্তিরবেলা মা বললে—আয়, ভাত খাবি আয়—

বললাম—বড় ব্যথা করছে, আমি খাবো না—

দিদিমা বললে—সে কি, না খেলে চলবে কেন! এসো, সোনা এসো—এসো আমি খাইয়ে দেবো, কিচ্ছু কষ্ট হবে না তোমার—

আমি বললাম—না খাবো না, আমার যে খুব কষ্ট হচ্ছে—

কিছুতেই খেলাম না সে রাত্রে, মা আমার পাশে শুলো, আর একপাশে দিদিমা, মাথার কাছে টুলের ওপর এক গেলাস দুধ রইলো। দিদিমা বললে—যদি রাত্তিরে খিদে পায় তো দুধটুকু খেয়ে নিও, বুঝলে—

সমস্ত রাত আমার ঘুম এল না। চোখের সামনে যেন দেখতে পেলাম ডাক্তারবাবু সাদা চক্‌চকে ছুরিটা নিয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, আর একটু একটু করে এগিয়ে আসছে। থরথর করে কেঁপে উঠলাম। ছাদের ওপর টপটপ করে হরতকী ফলগুলো পড়ছে, চিড়িয়াখানার ভেতর থেকে একটা সিংহ বুঝি হঠাৎ হুঙ্কার দিয়ে উঠলো—নৌকোর মাঝিরা ঘাটের ধারে সুর করে গান গাইছে—সব শুনতে পেলাম শুয়ে শুয়ে। শুনতে পেলাম কারা যেন অতরাত্রে গোয়ালটুলির রাস্তা ধরে হেঁটে চলেছে কথা বলতে বলতে—হয়তো পোড়াবাজারে যাত্রা শুনে ফিরছে। তারপর শুনতে পেলাম রাস্তার জল দেবার গাড়ি চলেছে বিকট শব্দ করতে করতে। তারপর পাশের মেথরদের পাড়ায় শূয়োরগুলো ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করতে করতে গঙ্গার দিকে চড়তে বেরলো। ভোরের দিকে যারা গঙ্গা-স্নান করতে যায় তারা এবার ফিরছে স্তোত্র পাঠ করতে করতে। শনি-ঠাকুরের মন্দিরে ঘণ্টা বেজে উঠলো ঢং ঢং করে। রাত বোধহয় চারটে কি পাঁচটা।

বিছানা ছেড়ে উঠলাম। দিদিমা উসখুস করছে। ওঠবার সময় হয়েছে দিদিমার। মা তখনও অঘোরে ঘুমোচ্ছে। এই মামারবাড়িতে এসেই মা'র যা কিছু বিশ্রাম। বাদামতলায় মা ওঠে ভোররাত্রে। তখন আমি ঘুমিয়ে থাকি, বাবাও ঘুমোয়। তখনি উঠে উনুনে আগুন দিতে হয়। আপিসের ভাত দিতে হবে। সাড়ে ন'টায় বাবার আপিস। ঝি আসবে বাসি বাসন মাজতে। কিন্তু এখানে আলাদা। এখানে মা বেলা পর্যন্ত ঘুমোলেও কেউ কিছু বলবে না। মা এখানে আরাম করতে এসেছে। বেলা করে ঘুমোতেই তো এসেছে।

সকলের চোখ এড়িয়ে ঘরের খিল খুললাম। তারপর আস্তে

আস্তে দরজাটা ভেজিয়ে বাইরের বাড়ির উঠোনে এসে পড়েছি। দিদিমা'র চাবি ঝুলতো দেয়ালের একটা পেরেকে। সেখান থেকে চাবিটা নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠবার দরজাটা খুলে আবার যথাস্থানে চাবিটা রেখে দিয়ে এলুম। কেউ যেন আমাকে খুঁজে না পায়। এমন জায়গায় লুকোবো, কেউ যেন দেখতে না পায়। বাবা এসে সকালবেলা আমায় ডাকবে! তার আগেই সারাবাড়িতে তোলপাড় পড়ে যাবে। দিদিমা হন্তদন্ত হয়ে এদিক ওদিক দেখবে। শোবার ঘরের দরজা খোলা। কোথায় গেল খোকন! বিছানায় তো নেই! মা'ও উঠবে। কোথাও খুঁজে পাবে না তাকে। বাবা এসে বসে বসে অপেক্ষা করে আবার ফিরে যাবে হয়তো। কিম্বা থানায় খবর দিতে যাবে। আমার ছেলেকে সকাল থেকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। এই ছোট্ট ছেলে। এখনও রাস্তা-ঘাট ভালো করে চেনে না। যদি খুঁজে পান তো খবর দেবেন!

ছাদে তখনও ভালো করে ভোর হয়নি। ন্যাড়া ছাদ। চিড়িয়াখানার দিকে তখনও ঝাপসা ঝাপসা আকাশ। পুবদিকে খালি আকাশটা একটু ফরসা হচ্ছে, ওই সাহাদের বাড়ির মাথার দিকটা! আর বাদামতলা! ওই কালিঘাটের পুলটার দিকেই তো বাদামতলা! বাদামতলার বাড়ির ভেতরে বাবা হয়তো এখন বিছানা ছেড়ে উঠি-উঠি করছে। পাঁচির-মা এসে বাসন নিয়ে কলতলায় বসবে। একখানা তো ভারি বাসন, আর হয়তো একটা বাটি। তারপরেই চৌবাচ্চার ছিপি খুলে দিয়ে বাসি জল ছেড়ে দিতে হবে। ভোলা কার্তিক সুরেশ্বরীদিদি তারা সব সেখানে এখন কি করছে কে জানে। সুরেশ্বরীদিদির কাজ না থাকলেও সকালে ওঠে। অন্ধ শ্বশুরের বাসি কাপড় বাসি ফতুয়া কেঁচে দিয়ে ঘরদোর ঝাঁট দিয়ে ফেলতে হবে। অন্ধ শ্বশুরের বকর-বকর শুরু হলো সেই সকালবেলা থেকেই। সে-বকুনি চলবে তারপর সমস্ত দিন—। রাত্রেও বিশ্রাম দেবে না।

পাশের হাজরা ডাক্তারবাবুর বাড়িতে তখন কাকীমা উঠেছে ঘুম থেকে।

—এই মিনি, মিনি—

চুপিচুপি ডাকলাম ছাদ থেকে।

মিনি উঠেছে সকাল-সকাল। নিচের কলতলায় মুখ ধুচ্ছিল। আমার গলা শুনে ওপর দিকে চাইলে। যেন ভার-ভার। কাল আমার জন্যেই তো মার খেয়েছে বাবা-মা'র কাছে।

আমার দিকে চেয়ে মিনি বললে—কি বল্?

বললাম—আয় না।

মিনি বললে—না, মা বকবে—

বললাম—লুকিয়ে লুকিয়ে আয় না—

মিনি বললে—তুই খিড়কির ধারে আয়, আমাকে দেখতে পেলে মা বকবে—

ছাদ থেকে নেমে সদর দরজা খুলে পেছনের গলি দিয়ে হাজরা ডাক্তারবাবুদের খিড়কির দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম। মিনিও এসে দাঁড়িয়েছিল, মুখটা তখনও ভার-ভার।

বললাম—কাল তো আমার জন্যে তুই খুব মার খেলি?

মিনি বললে—তোর খুব আনন্দ হলো বুঝি?

বললাম—বা রে, আনন্দ হবে কেন! সারারাত্তির তাই তো আমি ঘুমোতে পারিনি।

মিনি বললে—তোর ফোড়াটা কেমন আছে এখন?

বললাম—আজ বাবা আসবে এখনি, তোর বাবার কাছে নিয়ে যাবে আমাকে, তোর বাবা হয়তো কেটে দেবে ফোড়াটা ভাই—

মিনি প্রথমে কিছু বললে না, তারপর বললে—বেশ হবে, খুব লাগবে, খুব রক্ত পড়বে, আমার খুব মজা হবে—

মিনি কথাটা বলে বাড়ির ভেতরে চলে যাচ্ছিল।

বললাম—আমায় কোথাও লুকিয়ে রাখবি মিনি! যেখানে কেউ দেখতে পাবে না?

মিনি বললে—তাহলে মা যে আমাকে আবার মারবে!

বললাম—মা জানতে পারলে তো! কাউকে না জানালেই হলো!

—যদি কেউ জানতে পারে, তখন?

বললাম—আমি কাউকে তোর নাম বলবো না—আমাকে তোদের বাড়ির কোথাও লুকিয়ে রাখ, বাবা এসে চলে গেলে আবার বেরিয়ে আসবো চুপিচুপি—কেউ জানবে কি করে?

মিনি বললে—তা হলে দাঁড়া এখানে, আমি দেখে আসি মা আছে কি না—

তারপর একটু পরেই ফিরে এসে বললে—আয়—

মনে আছে সেদিন মিনিদের বাড়ির ভাঁড়ার ঘরে চালের জালার পেছনে কতক্ষণ যে লুকিয়ে ছিলাম খেয়াল ছিল না। অন্ধকার ভাঁড়ার ঘর। আরশোলা আর ইঁদুরের রাজ্যি। ভিজে স্যাঁতসেতে মেঝে। মাথাটা নিচু করে থেকে টনটন করছিল ঘাড়টা। সেখানে বসে বসেই কাকীমার কথা শুনতে পাচ্ছিলাম। তখন মিনিদের সারাবাড়িটার সংসারের চাকা চলতে শুরু করেছে। কাকীমা এসে ঘরের মেঝেতে বঁটি নিয়ে তরকারি কুটতে বসলো। তারপর রঘুকে বললে—ওরে, ভাঁড়ার ঘরে বড্ড আরশোলা হয়েছে, আজকে একটু পরিষ্কার করিস তো—

মনে হলো যেন দিদিমা এল এ-বাড়িতে! বললে—হ্যাঁ বউ, আমাদের খোকন এসেছে এ-বাড়িতে?

কাকীমা বললে—ওমা, না তো—কেন কোথায় গেল সে?

—কী জানি বউ, ভোরবেলা থেকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছিনে তাকে—কোথায় যে গেল!

কাকীমা বললে—হ্যাঁ রে মিনি, খোকনকে দেখেছিস—খোকন আজ সকালে এসেছিল?

মিনি দূর থেকে বললে—আমি জানি না—

কাকীমা বললে—না মাসীমা, আজ তো মিনি কোথাও বেরোয়নি—ওকে ওর সঙ্গে খেলতে বারণ করে দিয়েছি—

—কেন বারণ করে দিলে বাছা! ওইটুকু মেয়ে, ও কি অত বোঝে! কতই বা বয়েস ওর—

—না, পড়াশোনা চুলোয় গিয়েছে, আজ বাদে কাল বিয়ে হবে, ধিঙির মতন কেবল নেচে নেচে বেড়ালেই হলো! একটু বুদ্ধি-শুদ্ধি কিছু হতে নেই—

দিদিমা চলে গেল। বুঝলাম বাড়িতে খুব খোঁজাখুঁজি পড়ে গিয়েছে। আমি তখনও চুপ করে বসে আছি জালাটার আড়ালে। একে ফোড়ার যন্ত্রণা, তার ওপর অতক্ষণ ওইভাবে থেকে থেকে ঘেমে নেয়ে উঠেছি। ঠিক বুঝতে পারছি না বাবা এসেছে কি না। বুঝতে পারছি না কত বেলা হলো।

—এই, এখানে কে রে?

মাথা উঁচু করে দেখি রঘু আমার দিকে একদৃষ্টে দেখছে।

আমাকে দেখেই রঘু চিৎকার করে উঠলো—মা, এই দেখ, খোকন এখেনে লুকিয়ে রয়েছে,—এই বেরো, বাইরে আয়—

কাকীমা দৌড়ে এল। বললে—কে রে রঘু?

আমাকে দেখেই কাকীমা চিৎকার করে উঠলো—ওমা, খোকন তুই এখেনে? আর তোর দিদিমা মা সবাই খুঁজে গেল এ-বাড়িতে, তোর বাবা যে পুলিশে খবর দিতে গিয়েছে। যা তো রঘু ও-বাড়ির মা'কে খবর দিগে যা, বলে আয় খোকন এখানে আছে—

তারপর সে কি নাকাল! বাবা এসে আমাকে না পেয়ে থানায় গিয়েছিল। তাকে ডাকতে আবার লোক গেল। বাবা এসে বললে—কোথায় পাওয়া গেল খোকনকে?

দিদিমা বললে—লুকিয়ে ছিল ওদের বাড়িতে, ওদের ভাঁড়ার ঘরে চালের জালার পেছনে—

বাবা বললে,—চলো ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে যাই—

আমি কেঁদে ফেললাম। বললাম—লাগবে।

বাবা বললে—একটুখানি লাগবে, তা লাগুক, কিন্তু সেরে যাবে!

মনে আছে সেদিন যে কী যন্ত্রণা হয়েছিল। ডাক্তারবাবুর ডাক্তারখানায় গিয়ে আমাকে শুতে হলো একটা টেবিলে। মিনির বাবা হাজরা ডাক্তারবাবু একটা ছুরি নিয়ে আমার সামনে এল। জামাটা খুলে দিলে। তারপর বললে—চোখ বোঁজ তো? লক্ষ্মী-ছেলে···বাঃ, কিচ্ছু লাগবে না!

আমি তখন প্রাণপণে অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করছি। মিনির কথা ভাবতে চেষ্টা করছি। ঘুড়ি লাটাইয়ের কথা ভাবতে চেষ্টা করছি। বাদামতলা, ভোলা, কার্তিক, সুরেশ্বরীদিদির কথাও ভাবতে চেষ্টা করছি। কোথায় কবে ভোলাদের পুকুরে মাছ ধরতে গিয়ে চৌবেজী পেছনে তাড়া করেছিল, কবে সুরেশ্বরীদিদির বাড়ির পেছনের গাছে আমড়া পাড়তে গিয়ে সুরেশ্বরীদিদির অন্ধ শ্বশুর কী বলেছিল, কবে বটুক মিত্তিরের বাড়িতে লোহার ফটক ভেঙে ডাকাত পড়েছিল, কবে জলটুঙির ধারে জলের ওপর ছায়া দেখে মিনি আমাকে কী বলেছিল—

—বাঃ, বেশ লক্ষ্মীছেলে তো, এই দেখো, কিচ্ছু লাগবে না।

বাবা পা দুটো চেপে ধরেছে। পেছনে রঘু ধরেছে হাত দুটো লম্বা করে, আর কম্পাউণ্ডারবাবু হাতে তুলো ব্যাণ্ডেজ নিয়ে তৈরি হয়ে আছে—

—চোখ বোঁজ, চোখ বোঁজ—

মনে হলো হঠাৎ কে যেন আগুনের একটা ডেলা আমার কাঁচা চামড়ার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে আর আমি প্রাণপণে উচ্চশ্বাসে চিৎকার করে উঠেছি। সবাই মিলে আমার হাত পা সমস্ত শরীর আরো টিপে ধরেছে আরো জোরে।

তারপর আর জ্ঞান নেই। মনে হলো সমস্ত শরীর নিংড়ে কে যেন সব রক্ত সব শক্তি নিঃশেষ করে বার করে নিয়েছে, আমি নিস্তেজ হয়ে গিয়েছি, আমি মৃত, আমার প্রাণ নেই!

এ-সব কি আজকের কথা! এ-সব কি এখনকার কথা! অনেক দিন ধরে অনেকবার করে আঁকা জলরঙের ছবি। এতে অনেক ধুলো পড়েছে। অনেক ময়লা জমেছে, অনেক কালি লেগেছে সময়ের আর স্মৃতির। অনেক মানুষের অনেক হাতের স্পর্শে এ যে এতদিন বেঁচে ছিল এই তো এক আশ্চর্য ব্যাপার! হয়তো আবার ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করবার লোভ হয়েছে আমার, তাই হয়তো এসেছি এখানে। এই বারোর দুই-এর এফ বলাই সুর বাই-লেন-এর এই বাড়িতে।

পরদিন বিছানায় শুয়ে আছি আর আকাশ-পাতাল ভাবছি। দিদিমা বলেছে—আমি ভাতটা চড়িয়ে আসছি, কাঁদিসনে যেন আবার—

হঠাৎ মিনি ঘরে ঢুকেছে চুপিচুপি।

—খুব লেগেছে তোর?

মনে হলো খুব যেন মজা পেয়েছে মিনি। আস্তে আস্তে খাটের কাছে এল। একেবারে আমার বিছানার কাছে। আমার খুব কাছাকাছি।

—খুব লেগেছে তোর, না রে?

হঠাৎ কী যে হলো, গায়ে যত শক্তি তখনও ছিল সেই শক্তি নিয়ে ডান হাত দিয়ে এক চড় কষিয়ে দিলাম মিনির গালে, সে চড় তার গালের ওপর পড়ে ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

হঠাৎ চড় খেয়ে যেন মিনিও অবাক হয়ে গিয়েছে। আর আমি?

মিনির মুখের ভাবখানা কেমন হয়েছে তা আর দেখবার সুযোগ পেলাম না। দু'হাতে মুখ ঢেকে ঘর থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেল। বেশ হয়েছে! আমার কষ্ট দেখে যেমন খুব আনন্দ হয়েছিল, তেমনি হয়েছে!

তার কয়েকদিন পরেই গোয়ালটুলি থেকে আবার বাদামতলায় চলে এসেছিলাম। ফোড়ার দাগ একদিন মিলিয়েও এসেছিল। আবার একদিন একটা থার্ড ক্লাশ ঘোড়ার গাড়ি চড়ে গড়গড় করে গড়াতে গড়াতে কালিঘাটের উঁচু পুল পেরিয়ে বাদামতলার বাড়িতে এসে পৌঁছেছিলাম। আবার সেই ভোলাদের পুকুরে চুরি করে মাছ ধরা, সুরেশ্বরীদিদির বাড়িতে আমড়া গাছে ওঠা।

সুরেশ্বরীদিদি বলেছিল—কীরে, কবে মামারবাড়ি থেকে এলি?

রোয়াকের ওপর থেকে অন্ধ শ্বশুর বলেছিল—ও কে বৌমা—কার সঙ্গে কথা বলছো?

—ও সেই বটুক মিত্তিরের নাতি!

কোনও পরিবর্তন হয়নি এখানে, এই বাদামতলার জীবনযাত্রায়। ভোলাদের বাড়ি যেতেই খুন্তিদি বলতো—এই ছোঁড়া, আবার এসেছিস যে, পড়াশোনা নেই?

বলতাম—এখন তো গরমের ছুটি—

—গরমের ছুটি বলে তুই না পড়িস, ভোলা পড়বে, ভোলার লেখাপড়া আছে, ভোলা এখন যাবে না—যা—

ভোলা বলতো—এবার কিছু নিয়ে আসিস্‌নি?

বললাম—কী?

—ঘুড়ি! সেই যে তোকে ঘুড়ি দিয়েছিল সেবার, এবার কিছু দেয়নি?

বললাম—এবার আড়ি হয়ে গিয়েছে তার সঙ্গে!

—কেন রে?

বললাম—কানাই-এর সঙ্গে এবার তার খুব ভাব হয়েছে, তাই আড়ি করে দিয়েছি মিনির সঙ্গে—

সুরেশ্বরীদিদি বললে—তোর জন্যে এবার কী রেখেছি দেখ্—

—কী?

একটা লাল লাট্টু আর চারখানা ঘুড়ি। সুরেশ্বরীদিদি বললে—এবার আমচুর করেছিলাম, খাবি?

অন্ধশ্বশুর রোয়াকের ওপর ধন্ধুর মতো বসে ছিল। বললে—ও কে গো বৌমা—কে ও ?

—ওই বটুক মিত্তিরের নাতি।

—ওদের এককালে খুব বোল্‌বোলা ছিল গো, ওদের বাড়িতে এককালে একবার ডাকাত পড়েছিল জানো—! হ্যাঁ গা, সেই ওদের লোহার গেটটা এখনও আছে ?

তারপর বুড়োর বক্‌বকানি আর থামতো না। আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে আসতো দিনগুলো। সুরেশ্বরীদিদির আমচুর খেয়ে, লাট্টু ঘুরিয়ে, ঘুড়ি উড়িয়ে, ভোলাদের পুকুরে চৌবেজীর নজর এড়িয়ে বাটা মাছ ধরে, গোয়ালটুলির কথা আবার ফিকে হয়ে আসতো! গোয়ালটুলির সেই হরতকী ফল ছাদের ওপর পড়া, সেই জলটুঙির জলে ছায়া দেখা, সেই বাঘা-মামা, সেই পোড়া-বাজারের মাঠ, হরিণবাড়ির জেল, সেই চিড়িয়াখানা থেকে বাঘ-সিংঙ্গীর ডাকে ঘুম ভেঙে যাওয়া—সব আবার ফিকে হয়ে গেল। আবার বাদামতলার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লাম। আবার কালীঘাট স্টেশনে গিয়ে একা একা ঘুরে বেড়াই। সুরেশ্বরীদিদির বাড়ির সামনে যখন যতীনবাবু সাইকেল নিয়ে টিং টিং করে, আমাকে দেখে বলে—খোকা—ট্যাক্সের টাকাটা দিতে বলো তো—

যখন বাদামতলায় থাকতাম তখন বাদামতলার কথাই মনে পড়তো, আবার যখন গোয়ালটুলিতে থাকতাম তখন গোয়ালটুলির কথাই মনে পড়তো। সেই সময় বাদামতলার কথা একেবারে ভুলে যেতাম। ছেলেবেলাকার মন—স্থায়ীভাবে কোনও দাগ পড়তো না। এমনি করে গোয়লটুলিতে বার বার গিয়েছি, বার বার চলে এসেছি, কখনও ঘুড়ি ওড়াবার নেশায় মেতেছি, কখনও বা ঘোড়ার গাড়ি চড়বার আনন্দে আর সব ভুলে গিয়েছি। কিন্তু এবার চলে আসবার দিন কেমন যেন মন কেমন করেছে। দিদিমার জন্যে নয়, আর একজনের জন্যে ঘোড়ার গাড়িতে উঠে বার বার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখেছি—কেউ কোথাও নেই। দিদিমা শুধু বাড়ির সদরদরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে চোখ ছলছল করে। বলেছে—খোকা কেমন থাকে একবার খবরটা দিস্ খুকি—

তারপর গাড়িটা চলতে আরম্ভ করবার আগে দিদিমা দরজার

বাইরে গলা বাড়িয়ে বাবাকে বলছে—কালকে আপিস থেকে ফেরবার পথে আমাকে খবরটা দিয়ে যেও, ভুলো না—

আমি কিন্তু তখন হাজরা ডাক্তারবাবুর বাড়ির পাশের সরু গলিটার ভেতর যতটা নজর যায় চেয়ে দেখছি—কাউকে দেখতে পাওয়া যায় কিনা, প্রত্যেকবার যাবার সময় যেমন দাঁড়িয়ে থাকে তেমনি কেউ ওখানে দাঁড়িয়ে আছে কি না। চলে যাবার সময় অন্য বারের মতো কেউ আমার গাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে কিনা।

হঠাৎ দেখি দৌড়তে দৌড়তে কানাই দেখতে এল।

কানাই বললে—এই আমি তোদের গাড়ির পেছনে উঠবো—

বাবা সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠেছে—না না, খবরদার—

গাড়ি তখন চলতে আরম্ভ করেছে আস্তে আস্তে। আমি চিৎকার করে উঠলাম—গাড়োয়ান পেছনে ছিপ্‌টি—

পেছনে চড়ে চড়ে অনেক দূর বিনা পয়সায় যাওয়া যায়। আমি আর ভোলা বাদামতলায় কতবার ঘোড়ার গাড়ির পেছনে চড়ে অনেক দূর চলে গিয়েছি। একেবারে বাদামতলার গণ্ডি থেকে বাদামতলার হাট পর্যন্ত। গাড়োয়ান টের পায়নি। পাবার কথা নয়। সামনে চেয়ে সে চালাচ্ছে, আমরা পেছনে বসে গড়গড় করে গড়িয়ে চলেছি। হঠাৎ হয়তো কেউ দেখতে পেয়ে চিৎকার করে উঠেছে—গাড়োয়ান পেছনে ছিপ্‌টি—আর সঙ্গে সঙ্গে গাড়োয়ান তার লম্বা ছিপ্‌টি দিয়ে পেছনে মেরেছে। সে চাবুক পিঠে এসে লাগতেই আমরা লাফিয়ে দে-ছুট।

হয়তো সেদিন গাড়োয়ানের সেই চাবুক কানাই-এর পিঠে পড়েছিল—হয়তো পড়েনি। কানাই-এর ওপর আমার রাগ ছিল বলেই হয়তো সেদিন সেইভাবে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু কানাই-ই কি আমার কম সর্বনাশ করেছিল?

কিন্তু সে-কথা এখন থাক!

এমনি করেই বছরের পর বছর বাদামতলা থেকে ইস্কুলের ছুটির সময় মামারবাড়ি গিয়েছি। মা'র যখন খুব অম্বলের অসুখ, তখন যাদের পয়সাকড়ি আছে তারা যেমন কেউ মধুপুর কেউ শিমুলতলা কেউ বভিনাথ গিয়েছে, আমরা তেমনি গিয়েছি মামারবাড়ি। মামারবাড়িতে গেলে মা'কে রান্না করতে হতো না।

বাসন মাজতে হতো না, ঘর ঝাঁট দিতে হতো না। দিদিমা, আমার সেই বুড়ী দিদিমা, বৈষ্ণবদাস সিংহীর পরিবারের শেষ কুলবধূ, নিজে হাতে উনুনে আগুন দিয়েছে, নিজের হাতে রান্না করেছে আর মেয়ে নাতি সকলের সেবা যত্ন করেছে।

দিদিমা বলতো—তুই একটু বোস খুকি, আমি দেখছি—

মাকে কোনও কাজই করতে দিতো না দিদিমা। দিদিমা হয়তো মা'কে আমাকে খেতে দিয়ে রান্নাঘর ধুয়ে মুছে সবে পাথরের থালায় ভাত নিয়ে বসেছে, এমন সময়ে পাড়ার কে একজন এসে বলে গেল—জ্যাঠাইমা, বাঘাদা'কে দেখলাম পুলিশে ধরে নিয়ে যাচ্ছে থানায়—

দিদিমার ভাত খাওয়া মাথায় উঠলো। এক বেলাই খেতো দিদিমা, তা-ও হলো না সেদিন।

দিদিমা ভাত ফেলে দিয়ে উঠতো। বলতো—কোথায় দেখলে বাবা বাঘাকে?

—এই তো পোড়াবাজারের রাস্তায়, দেখলাম বাঘাদা'র কোমরে দড়ি বেঁধে লালপাগড়ি থানায় নিয়ে যাচ্ছে—

—কী করেছিল বাবা?

এমনি কতদিন! ভোরবেলা সবে হয়তো তখন কাকপক্ষী ডাকতে শুরু করেছে, এমন সময়ে সদরদরজায় জোরে জোরে ঘা পড়তে লাগল। দিদিমা উঠোনে গোবর জলছড়া দিতে দিতে বললে—কে গা? কে এলি?

বাইরে থেকে তবু কড়া নাড়ছে জোরে জোরে।

দিদিমা বললে—দাঁড়া 'রে দাঁড়া, হাতটা ধুয়ে খুলছি দরজা—দরজা ভেঙে ফেলবি নাকি—কে তুই—?

তারপরে দরজা খুলেই দিদিমা হতভম্ব। একজন পাহারাওলা, ছুম্বো চেহারা। মাথায় লালপাগড়ি। পেছনে দাঁড়িয়ে বাঘা। মাথা নিচু করে। তার হাতে একগাদা এঁটো থালা বাসন।

পাহারাওলাটা জিজ্ঞেস করলে—এ আপ্‌কা লেড়কা?

দিদিমা বাঘাকে দেখেই কেঁদে উঠেছে হাউ হাউ করে—হ্যাঁ, বাবা, ও আমার ছেলে, বাঘা—

—এ ঝুঠা বাসন কিস্‌কা?

কলতলার দিকে চেয়ে দেখলে দিদিমা। বাসনগুলো তো সত্যিই নেই। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর এঁটো থালা বাটি ঘটি সব জড়ো করা থাকে উঠোনে। তারপর সকালে উঠে মাজে দিদিমা। বাঘার হাতের থালা বাসনগুলোর দিকেও আর একবার চেয়ে দেখলে। রাত্রে বাঘা এসে খেয়েছে, খেয়ে দেয়ে শুতে গিয়েছে তার নিজের ঘরে। তারপর কখনই বা উঠলো ঘুম থেকে, আর কখনই বা বাসনগুলো নিয়ে বেরোলো।

পাহারাওলা বললে—এ বাসন সব আপ্‌কা? চোট্টা বলছে কি এসব আপ্‌না বাসন—ভোরবেলা রাস্তামে পাকড়িয়েছি—

বাঘা হঠাৎ বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ বাছাধন, আমি কি মিথ্যে কথা বলেছি তোমাকে! এসব আমাদের নিজেদের বাসন, এ তো আমাদের বাড়ি, মাইজীকে জিজ্ঞেস করো না—বলো না মা!

—তোম্ চোপ্‌রাও—

—আরে বাবা, তুমি যে একেবারে দারোগো সাহেবের বাড়া হলে বাপু, আরে বৈষ্ণবদাস সিংহীর নাম শুনা হ্যায়? বৈষ্ণবদাস সিংহী? যত সব গো-মুখ্যুদের পুলিশের চাকরি দিয়ে মহা মুশকিলে ফেলেছে তো!

—কেয়া?

—আরে বাবা, লেখাপড়া জান্‌তা হ্যায়? এ বৈষ্ণবদাস সিংহীকা বাড়ি! লাটসাহেব হেস্টিংস সাহেবকা পেয়ারের আদমি থা! ছিয়াত্তুরে মন্বন্তরকা সময় সে কলকাত্তাকা বহুত্ উপকার কিয়া—তোম্ সেই বংশকা ছেলেকো হয়রানি করতা হ্যায়?

—চোপ রও উল্লুক।

দিদিমা কেঁদে উঠলো। বললে—তুমি কেন বাছাকে এত নাজেহাল করছো পাহারাওলা? ওকে ছেড়ে দাও না বাপু।

পাহারাওলা বললে—নেহি, থানামে জানে হোগা—

বাঘা-মামা দাঁত বার করে চেঁচিয়ে উঠলো—

—মাইরি আর কি, থানায় যাবে, নিজেদের বাসন নিজে নিয়ে যাচ্ছি, হোক এঁটো হোক ময়লা তাতে তোমার কী বাছাধন? ইংরেজ রাজত্বে বাস করছি, কারোর তো তোয়াক্কা করি না—

দিদিমাও বললে—বাছা তো আমার ঠিকই বলছে, আমার

বাসন আমি ওকে দিয়েছি, তুমি কেন ওকে হেনস্থা করছ পাহারাওলা?

পাহারাওলাটা যেন এতক্ষণে নিজের ভুল বুঝতে পারলে। 'তোবা তোবা' বলে সে চলে গেল। খানিকক্ষণ দিদিমা একদৃষ্টে চেয়ে দেখলে বাঘার দিকে। তারপর বললে—হ্যাঁ রে, শেষে তোর মনে এই ছিল?

বাঘা-মামা বললে—এইবার চেঁচাও, চেঁচিয়ে পাড়ার লোক জড়ো করো—

—হ্যাঁ রে, পুলিশে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল তোকে, সেই-ই তোর ভালো হতো?

বাঘা-মামা বললে—থামলে কেন, চেঁচাও—

—তুই বলছিস কী বাঘা, আমার যে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করছে তোর জন্যে! সিংহী বংশের ছেলে হয়ে তোকে থানায় যেতে হয়, আমার যে···

—হয়েছে, হয়েছে, আর আদিখ্যেতা করো না, থানায় গেলেই এখন দেখছি ভালো হতো। উঃ জ্বালিয়ে খেলে! চেঁচিয়ে পাড়ার লোক জড়ো করো এখন, সবাই দেখুক সিংহী বংশের ছেলের সংসারে কত সুখ আছে! দেখুক না এসে সবাই—ছেলের হাতখরচের টাকা যদি যোগাতে না পারো তো জন্ম দিতে গেলে কেন শুনি? আঁতুড়ঘরে গলা টিপে মারতে পারোনি?

দিদিমা বললে—হ্যাঁ রে, তা হাতখরচের টাকা আমি তোকে দিইনি? আজ তুই এই কথা বলছিস? তাহলে আমার তাগা, বিছে হার মাথার চিরুনি সব গেল কোথায়?

বাঘা-মামা বললে—কেবল সেই এক কথা তোমার মুখে। তোমার তাগা, বিছে হার মাথার চিরুনি পেলেই তো হলো?

—আমি বিধবা মানুষ, ও-সব নিয়ে আমি কী করবো? তোর জন্যেই তো রাখি, আমি যখন থাকবো না, তোকে কে দেখবে বল তো?

—আর দেখে কাজ নেই গো, যথেষ্ট হয়েছে, সাতদিন ধরে হাতে একটা আধলা নেই, পেট ফেঁপে ফেঁপে উত্তুরি হবার যোগাড়। আবার মা-পনা দেখাচ্ছে! বলি মেয়ে-জামাইকে তো সবই দিয়েছ,

আর আমি বুঝি শালা বানের জলে ভেসে এসেছি? আমি বাড়ির কেউ না?

—ওমা, বলছিস কি তুই বাঘা? তুই আমার পেটের ছেলে, তুই এই কথা বললি? বলতে পারলি তুই? তারপর হাত জোড় করে ঠাকুরের উদ্দেশে বলতে লাগল—ঠাকুর জানে, আমার ঠাকুর জানে…

—থাক থাক আর সকালবেলা দিব্যি গালতে হবে না, এখন বাসনগুলো রাখো, ভেবেছিলাম কিছু রোজগার করবো আজ, তা পাহারাওলা বেটার জন্যে হলো না—এখন কী দিয়ে যে আজকের দিনটা চালাই—

—তোর কীসের ভাবনা বাঘা, আমি তো আছি, আমি যদ্দিন আছি, মরে হেজে তোকে কষ্ট করতে দেবো না, আয়, মুখ ধো, এখনও বাসি মুখে জল পড়েনি—মুড়ি আর গুড় দিচ্ছি খা—

বাঘা-মামা বোধহয় বাড়িতেই ঢুকতো কিন্তু মুড়ি গুড়ের কথা শুনেই ক্ষেপে উঠলো—দুত্তোর গুড় মুড়ির মুখে ঝাঁটা মারি, সকালবেলা গুড় মুড়ি—গুড় মুড়ি আমার চাই না, ও খেয়ে খেয়ে আমার পেটে চড়া পড়ে গিয়েছে। তার চেয়ে দুটো টাকা ছাড়ো দিকিনি, বুঝবো কেমন পুত্রস্নেহ তোমার—ছাড়ো—

দিদিমা বললে—টাকা কোথায় পাবো বল?

—দেখো ইয়ারকি করো না বলছি। খালি পেটে ইয়ারকি ভাল্লাগে না!

—ছিঃ বাবা, অমন করে কি মায়ের সঙ্গে কথা বলতে হয়—?

—ওঃ, ভারি আমার মা রে! একটা পয়সা হাত খরচ দেবার বেলায় লবডঙ্কা, আবার মা-পনা দেখানো হচ্ছে? দূর হোক গে, তার চেয়ে জেলে যাওয়া ভালো ছিল। লোকে তবু বুঝতো কত দুঃখে সিংহী বাড়ির ছেলে জেলে যায়—যাই, জেলেই যাই—

বলে হয়তো সত্যিই জেলে চলে যাচ্ছিল বাঘা-মামা, দিদিমা চিৎকার করে উঠলো।

—ওরে, এই নে বাবা, টাকা নিয়ে যা, কয়লাওলাকে দুটো টাকা দেবো বলে রেখেছিলাম, সেই টাকা দুটোই নিয়ে যা, জেলে গেলে তোর কষ্ট হবে বাবা, সেখেনে গেলে তোর হাড় মাস্ এক থাকবে না বাবা—তোর জন্যে আমি কেঁদে মারা যাবো বাবা—

—তাই মরে যাও না, মরোও না তো তুমি! কি অক্ষয় পেরমায় তোমার মাইরি?

দিদিমা চোখে আঁচল দিতো। বলতো—আমি মরবো রে, আমি মরেই যাবো শিগগির, আমি আর বেশিদিন বাঁচবো না, আমার যা শরীরের গতিক—

—বেশ তো, শশীপোদ্দার তেরো হাজার টাকা দিতে চাইছে—বলছে ভাঙা বাড়ি, আমি বলছি পনেরো, তা যাক গে, লোকসানের কপাল, তেরো হাজার, তেরো হাজারই সই—

তা বাঘা-মামার কথাই শেষ পর্যন্ত ফলেছিল।

শ্যামবাজারের পোদ্দারমশাই তেরো হাজার টাকাতেই কিনেছিল বাড়িটা। দিদিমার তখন অসুখ। অসুখের ঘোরে উঠতে পারে না। মার সঙ্গে আমিও গিয়েছি সেবার। তখন অনেক বড় হয়েছি। এবার আর গরমের ছুটিতে নয়, অসময়ে এসেছি। দিদিমার অসুখের খবর শুনে বাবা মা'কে আর আমাকে নিয়ে এসেছে।

বাঘা-মামার চেহারা দেখে এবার অবাক হয়ে গেলাম। দেখি আর সে উস্কো-খুস্কো চুল নেই। চকচকে লপেটা পায়ে, গায়ে মলমলের পাঞ্জাবি। হাতে পেঁচানো বাঘমুখো ছড়ি। মুখে সিগারেট সারা গায়ে বেশ কড়া একটা কিসের গন্ধ বেরোচ্ছে।

আমাকে দেখেই ধরেছে—

—এই ছোঁড়া, কি করতে এসেছিস রে? খেতে? মামারবাড়ি দুধ-ঘি খেতে? আফিং ধরেছিস বুঝি?

বললাম—না—

আলবৎ ধরেছিস, নইলে এত দুধ-ঘি খাবার লোভ কেন রে? দেখি, জিভ দেখি—

জিভ বার করতেই বাঘা-মামা এক হাতের আঙুল দিয়ে জিভটা টেনে ধরেছে—

বললে—লাগছে?

মাথা নাড়লাম।

—লাগছে আর তবু বলছিস আফিং খাস না—আলবৎ খাস! আফিং না খেলে জিভ টিপলে এত লাগে কেন?

আমি ততক্ষণ যন্ত্রণায় চিৎকার জুড়ে দিয়েছি। আমার কান্না

শুনেই মা দৌড়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। তারপর সামনে বাঘা-মামাকে দেখেই বললে—আচ্ছা দাদা, কেন তুমি একে দেখতে পারো না বলো তো? কি করেছি আমি তোমার?

বাঘা-মামা বললে—আর মায়া-কান্না কাঁদতে হবে না, সব ল্যাঠা চুকিয়ে দিয়েছি!

বলে হো হো করে হেসে বাঘা-মামা লম্বা করে সিগারেট টানতে লাগল।

মা বলতে লাগল—তোমার কি একটা আক্কেলও থাকতে নেই দাদা, মা মরো-মরো, আমার সাতদিন ঘুম নেই চোখে, ডাক্তারে ওষুধে কত টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে, তোমার কি কোনও হুঁশই থাকতে নেই?

—অঁ্যা, ডাক্তার কে ডেকেছে?

বাঘা-মামার রূপ যেন হঠাৎ বদলে গেল ডাক্তারের নাম শুনে।

—কে ডেকেছে ডাক্তার, বল?

মা বললে—কে আবার ডাক্তার ডাকবে, আমিই ডাক্তার ডেকেছি! মানুষটা যন্ত্রণায় ছটফট করছে, আমি এলুম তাই এক ফোঁটা জল পড়লো মুখে! তুমি কী দাদা? তুমি কী!

—ন্যাকামি রাখ, ডাক্তার ডেকেছিস কেন বল?

আমার কেমন যেন ভয় করতে লাগল। মনে হলো বাঘা-মামা যেন এখনি মাকে মারবে। যেমন করে আমাকে মেরেছে। তেমনি করে মারবে!

মা আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বললে—ডাক্তার ডেকে কি এমন অপরাধ করেছি বলো?

বাঘা-মামা বললে—সুদ দিতে হচ্ছে না আমাকে? পকেট থেকে সুদ দিচ্ছি যে মাসে মাসে, সেটা তো আমার গায়েই লাগছে!

—কিসের সুদ? মা যেন বুঝতে পারলে না ঠিক!

ঘরের ভেতর থেকে দিদিমা হঠাৎ কাতর একটা শব্দ করে উঠলো।

—মাসে মাসে মিছিমিছি চব্বিশটা করে টাকা গুনোগার যাচ্ছে আমার ওই বুড়ির জন্যে, তেরো হাজার টাকা নিয়েছি, এখনও বাড়ি খালি করে দিতে পারলুম না, ভদ্দরলোকের কাছে কথার খেলাপ করতে হচ্ছে, আমার যে কি লোকসান, তুই কি বুঝবি?

—দাদা!

বাঘা-মামা বললে—আমি ভেবেছি ওষুধ-বিষুধ না দিলে বুড়ী তিনদিনেই পটল তুলবে, ভেতরে ভেতরে মায়ের পেটের বোন হয়ে তোর এত শয়তানি, দাঁড়া—

মনে আছে বাঘা-মামা তখুনি দিদিমার ঘরে গিয়ে যত ওষুধ-শিশি-বোতল ছিল সব জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছিল। মা বাধা দিতে গিয়েছিল, কিন্তু তার আগেই সব ফেলা হয়ে গিয়েছে।

মা বললে—দাদা, করলে কি? মা যে···

মামা বলেছিল—দূর, ও ঘাটের মড়াকে জীইয়ে রেখে লাভ কি? শুধু শুধু তোর অত কষ্টের পয়সা নষ্ট আর আমার লোকসান—পোদ্দারমশাই কি ভাবছে বল দিকি, ভদ্দরলোকের কাছে কথার খেলাপ! বলেছিলুম বাড়ি খালি করে দেবো সাতদিনের মধ্যে—বলতে বলতে বাঘা-মামা ছড়ি ঘুরিয়ে বাইরে চলে গেল।

বাবা সন্ধ্যাবেলা আপিস থেকে আসতেই সব শুনে বললে—মা'কে বাদামতলায় নিয়ে গেলেই ভালো হয় দেখছি—

কিন্তু সে-রাতটা আর কাটলো না। বাদামতলায় আর নিয়ে যেতেও হয়নি দিদিমাকে! বৈষ্ণবদাস সিংহীর কুলবধূ গোয়ালটুলির ভিটেতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল। পরদিন যখন সবাই শ্মশান থেকে ফিরে এসেছে, বাঘা-মামা এসে হাজির।

বললে—এই যে—

মা কাঁদছিল। মামা বললে—এবার তো সম্পর্ক ঘুচে গেল, এবার যা, উঃ খুব জ্বালালে বুড়ীটা; মরেও মরতে চায় না, কথার খেলাপ করতে হলো না ভদ্দরলোকের কাছে এই রক্ষে—

মনে আছে জীবনের সেই প্রথম পর্যায়ে একদিকে মানুষের নিষ্ঠুরতা আর একদিকে মানুষের অসহায় অবস্থা দেখে আমার সেদিন চোখে জলই এসেছিল সত্যি! গোয়ালটুলি আজ অনেক বদলে গিয়েছে, হয়তো তার নামও বদলে গিয়েছে, কিন্তু মানুষগুলো হয়তো সেই রকমই আছে আজো। আজো হয়তো সেই পুরনো বাড়িটার মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালে একটা ছোট শিশুর কান্না শুনতে পাওয়া যাবে! হয়তো খিড়কি পেরিয়ে হাজরা ডাক্তারবাবুর

বাড়ির পেছনের দরজায় দাঁড়ালে একজোড়া কৌতূহলী চোখ খুঁজে পাওয়া যাবে। সে হয়তো ওখানে আজো খুঁজে খুঁজে বেড়ায় একজনকে। কিন্তু দেখা পায় না আর।

কানাই বলেছিল—এই, মিনির কী হয়েছে জানিস?

বলেছিলাম—না তো—

কানাই বলেছিল—তার মা তাকে আর রাস্তার বেরোতে দেয় না—

এ সেই শেষবারের মতন যেবার গোয়ালটুলিতে গিয়েছিলাম, সেইবারের ঘটনা। অনেক দিন পরে সেবার গিয়েছি। থার্ড ক্লাশ ঘোড়ার গাড়িটা কালিঘাটের পুলের ওপর ওঠবার পর থেকে চোখের সামনে থেকে সব যেন মুছে গেল। সেই পুলিশটা সেবারও তেমনি করে দাঁড়িয়ে ছিল। ট্রাম লাইনের ওপর গাড়িটা গড়গড় করে গড়িয়ে যাচ্ছে, বাবা কত রকমভাবে সাবধান করে দিচ্ছে মা'কে—আমার কানে কিছুই ঢুকছে না। আবার বাদামতলার সব কথা ভুলে গিয়েছি, কেবল গোয়ালটুলির কথা মনে আসছে। ঘুড়ি, লাটাই, শনি-ঠাকুরের মন্দির, গঙ্গারঘাট, কানাইদের খড়ের গোলা, মিনিদের ডাক্তারখানা! আমি যেন জড়িয়ে পড়েছি আবার নতুন করে গোয়ালটুলির জীবনের সঙ্গে।

সাহাদের বাড়িটা পেরিয়েই গঙ্গাটা নজরে পড়লো। সেই ভাঙা রোয়াক, নর্দমা, জলের কলের সামনে লোকের ভিড়—আর তারপরেই হাজরা ডাক্তারবাবুর ডাক্তারখানা। কিন্তু কই, ঘোড়ার গাড়ির চাকার শব্দ শুনেও তো কেউ বাইরে বেরিয়ে এল না। দিদিমা বোধ হয় তৈরিই ছিল। সদর দরজা খুলে এগিয়ে এল। বললে—এসো বাবা এসো—থাক থাক আর নমস্কার করতে হবে না।

বলে চিবুকে হাত দিয়ে চুমু খেলে।

মাও দিদিমাকে প্রণাম করলে। বাবাও নিচু হলো।

দিদিমা বললে—তোমাদের দেরি দেখে আমি তো ভাবছিলুম—

জামাকাপড় তখনও ছাড়া হয়নি। সেই অবস্থাতেই খিড়কির দরজা দিয়ে এক ছুটে বেরিয়ে গেলাম ডাক্তারবাবুর বাড়ির দিকে। দরজা বন্ধ ছিল। অনেকক্ষণ কড় কড় করে কড়া

নাড়বার পর দেখি কাকীমা দরজা খুলে দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখে কেমন যেন মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল কাকীমার। তাড়াতাড়ি নিচু হয়ে পায়ের ধুলো মাথায় ঠেকিয়ে বললাম—এই এখুনি এলাম কাকীমা—

'হাঁ' কি 'না' কিছুই বললে না কাকীমা। কিংবা কী বলবে তাই যেন ভাবতে লাগল।

আমি আবার বললাম—মিনি কোথায় কাকীমা?

কাকীমা যেন একটু থেমে বললে—মিনি আছে, কিন্তু তুমি আর এ বাড়িতে এসো না বাবা—

কেমন যেন চমকে উঠলাম। তবু বললাম—কেন?

কাকীমা বললে—না, মিনি এখন বড় হয়েছে—

কথাটা বলেই আমার হতবাক দৃষ্টির সামনে কাকীমা হঠাৎ সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিলে। আমি খানিকক্ষণ সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম সেইভাবে। তারপর নিজের মনেই যেন নিজের চেহারাটা দেখে নিলাম। আমিও কি বড় হয়েছি? তা বড় হয়েছিই বৈ কি! এই তো ধুতি পরিয়ে দিয়েছে মা। তাড়াতাড়ি আবার মামারবাড়িতে ঢুকে দেখি মা আর দিদিমা গল্প জুড়ে দিয়েছে। আমি বড় হয়েছি, আমি এক পাশে সরে দাঁড়ালাম। তারপর আস্তে আস্তে ঘরে চলে এলাম। একেবারে ঘরের ভেতরে। ঘরের এক-পাশে একটা আয়না টাঙানো ছিল। মা ওই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধতো। আমিও মুখ দেখেছি ওই আয়নাতে। কিন্তু আজ চারিদিকে একবার দেখে নিলাম। তারপর একটা চেয়ারের ওপর উঠে আয়নাতে নিজের মুখখানা দেখতে লাগলাম। কই, বড় হয়েছি কোথায়? বাবার মতন তো গোঁফ দাড়ি ওঠেনি। মুখ চোখ নাক কপাল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। কোথাও বড় হওয়ার কোনও চিহ্ন দেখতে পেলাম না। মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমি যেন হেরে গিয়েছি মিনির কাছে। মিনি বড় হয়ে গেল। আমি তো বড় হতে পারলাম না।

বিকেলবেলা কানাই দৌড়তে দৌড়তে এল। বললে—চল জলটুঙির ধারে বেড়াতে যাই—

বললাম—না।

কানাই অবাক হয়ে গেল। বললে—কেন? চল না, জলের ধারে দু'জনে খেলবো—

বললাম—মিনিকে ডাক—

কানাই যেন কেমন হয়ে গেল। বললে—না, মিনিকে ডাকবো না আর, মিনির মা বকবে—

—কেন, বকবে কেন? মিনি আর বেড়ায় না?

কানাই বললে—না।

—কেন?

কানাই বললে—তুই কাউকে বলবি না বল? মিনির ছেলে হবে—

কথাটা শুনে চমকে উঠলাম। বললাম—কি করে হবে, মিনির তো বিয়ে হয়নি—

কানাই বললে—ওর মা ওকে খুব মেরেছে, কাউকে মিশতে দেয় না ওর সঙ্গে—

বললাম—রঘু কোথায়?

কানাই বললে—রঘুকে তাড়িয়ে দিয়েছে ওর বাবা—এইবার বিয়ে হবে মিনির—

চুপি চুপি কথা বলছিল কানাই। কিন্তু কথাটা মুখর হয়ে সারাদিন আমার মনে গুঞ্জন করতে লাগল। সারাদিন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে রইলাম। দিদিমা বললে—কি হলো রে তোর ছেলের, খুব যে শান্তশিষ্ট হয়েছে আজকাল—

কিন্তু তারপরেই একদিন শানাই বেজে উঠলো হাজরা ডাক্তার-বাবুর বাড়িতে। ছাতের ওপর হোগলা দিয়ে ম্যারাপ বাঁধা হলো। লোকজন এল। আর তারপর বিয়ের দিন সেই বৃষ্টি আর বৃষ্টিতে বরও ভিজে একসা হয়ে গেল। সে ঘটনা তো আগেই বলেছি।

এমনি করেই একদিন বিয়ে হয়ে গিয়েছিল মিনির। কিন্তু আমার মনে হতো যদি কেউ জানতে পারে! যদি কেউ বলে দেয়! বিয়ের দিন যখন বরকে ভিজে কাপড় ছাড়িয়ে নতুন করে সাজিয়ে দেওয়া হচ্ছে, আমার কেবলই মনে হচ্ছিল ওই কথা।

তারপর যতদিন না দিদিমার মৃত্যু হয়েছে, ততবারই গিয়েছি গোয়ালটুলিতে। কোনওবার আর দেখা হয়নি মিনির সঙ্গে। কাকীমা এসেছে বেড়াতে, মা'র সঙ্গে গল্প করেছে। আমি পাশে বসে বসে কথাবার্তা শুনেছি। যদি মিনির কথা ওঠে তো শুনবো।

শুনেছি বিয়ের পর মিনি শ্বশুরবাড়িতে সুখে আছে, ছেলে মেয়ে হয়েছে—ইত্যাদি ইত্যাদি—

আর তারপর যখন পোদ্দারমশাই বাড়িটা নিয়ে নিলে, তখন থেকে আর মামারবাড়িতে যাওয়া হয়নি। বড় হয়ে শুধু মাঝে মাঝে মামাকে দেখেছি রাস্তায়। সেই তেড়ি, সেই মলমলের লম্বা-ঝুল-পাঞ্জাবি আর নেই। চটি ফটাস ফটাস করতে করতে রাস্তায় চলেছে। হঠাৎ আচমকা দেখা হয়ে যেতেই হয়তো হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলেছে—এই, তিনটে টাকা দিতে পারিস—বড় ঠেকায় পড়েছি—

কখনও আট আনা, কখনও বা পুরো একটা টাকা দিয়ে মামার হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েছি। কিন্তু কখনও জিজ্ঞেস করিনি—কেমন আছে মামা, কি ভাবে তার দিন কাটছে। বাড়িটা কত টাকায় বাঁধা দিয়েছে কিম্বা কী করছে।

রাস্তায় ঘাটে কখনও কখনও দেখা হয়েছে—আবার হয়তো বহুদিন দেখাও হয়নি। কখনও মামার অভাব বোধ করিনি সে-জন্যে। তারপর নিজেও নানাকাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি একদিন! তখন কোথায় মামা, কোথায় কানাই, কোথায় জলটুঙি, কোথায় মিনি—কারোর কথাই মনে উদয় হয়নি আর। জীবনের সেই প্রথম সংগ্রামের দিনে এক নিজে ছাড়া আর কারো দিকে নজর দেবার ফুরসুৎও ছিল না। শেষকালে একদিন কলকাতার বাদামতলা ছেড়ে সুদূর বিদেশে ভিন্ন পরিবেশের মধ্যেই তলিয়ে গিয়েছিলাম একেবারে।

তারপর এতদিন পরে আবার এই কলকাতায় বারোর দুই-এর এফ বলাই সুর বাই-লেন-এ এসে দাঁড়িয়েছি।

জীবনে তো কত লোককেই পেয়েছি, আবার কত লোককে তো হারিয়েওছি। কিন্তু হারাবার পর এমন করে কখনও হারানো মানুষের দরজায় ফিরেও তো আসিনি! বারবার সঙ্কোচ হয়েছে, দ্বিধা হয়েছে, আসবার আগে। কিন্তু এমন বিপদের দিনে যদি ফিরে না আসি তো আর কবে ফিরবো! কবে কাছে আসবো! আর তা ছাড়া, এখন তো আর বড়-ছোটর সম্পর্ক নয়!

ছোট মেয়েটা বাড়ির সামনে পৈঁঠেতে বসে ছিল।

জিজ্ঞেস করলাম—খুকি, তুমি এই বাড়িতে থাকো?

মেয়েটি দাঁড়িয়ে উঠে বললে—হ্যাঁ—

কী বলবো হঠাৎ মাথায় এল না। একবার মনে হলো জিজ্ঞেস করি—তোমার মা কী করছে? কিন্তু তারপরেই সামলে নিয়ে বললাম—তোমার বাবা, বাবা কোথায়?

মেয়েটি বললে—বাবার তো অসুখ, বাবা বিছানায় শুয়ে আছে—

—কী অসুখ তোমার বাবার?

—বাবার পা কেটে গিয়েছে, বাবা হাঁটতে পারে না।

খানিকক্ষণ ভাবলাম। তারপর বললাম—তোমার মা? মা বাড়িতে আছে?

মেয়েটি বললে—হ্যাঁ, ডাকবো?

বললাম—হ্যাঁ, একবার ডেকে দাও তো, বলো গিয়ে গোয়ালটুলি থেকে একজন লোক এসেছে—

মেয়েটি চলে গেল। সমস্ত শক্তি দিয়ে আমি মাটির ওপর পা ঠেকিয়ে রাখলাম। মনে হলো এখনি যেন পড়েও যেতে পারি। যেন আমার সামনে আমারই হারানো অন্তরাত্মার উদয় হবে। আর আমাকে দেখে আমিই অভিভূত হয়ে পড়বো। পাশেই রিক্সাওলাটা বোবার মতন দাঁড়িয়েছিল। অনেকক্ষণ ধরে তাকে আটকে রেখে দিয়েছি। অনেকক্ষণ সে আমার অনুসরণ করে আসছে। হয়তো মোটা ভাড়ার লোভে কিছু আপত্তি করছে না। শুধু হাতে আসতে নেই, তাই কয়েকটা জিনিষ কিনে এনেছি। মিনির স্বামীর জন্যে, মিনির ছেলে-মেয়ের জন্যে, মিনির জন্যেও এনেছি বৈকি। আর সবাই তো উপলক্ষ্য। লক্ষ্য তো মিনিই।

বলাই সুর বাই-লেনটা যেন চোখের সামনে থেকে আমার মুছে যাচ্ছে। পাশের বাড়ির উনুনের ধোঁয়া, রাস্তার লোক চলাচল, ফেরিওলার ব্যস্ত চিৎকার, সব যেন আমার মন থেকে দূরে অন্য কোথায় উধাও হয়ে গেল।

দেখলাম মেয়েটি আবার ফিরে আসছে, আর পেছনে মিনি!

আধময়লা একটা শাড়ি। হয়তো রান্না করছিল। রান্না করতে করতে হাতের হলুদ মুছেছে কাপড়ে। মাথায় একটুখানি ছোট ঘোমটা, হয়তো আমাকে চিনতে পারছে না। কী বলে

পরিচয় দেবো বুঝতে পারলাম না। সেই গোয়ালটুলির কথা নিশ্চয়ই মনে আছে, সেই জলটুঙির কথাই তুলবো। কিম্বা, সেই ঘুড়ি ওড়াবার কথা। মিনি লাটাই ধরতো আর আমি ঘুড়ি ওড়াতাম। কিম্বা সেই ফোড়া কাটাবার গল্প। চড় মেরেছিলাম মিনিকে। দাগটা গালের ওপর আজও আছে নাকি? কিম্বা…

মিনি একেবারে সদরদরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। এবার খানিকটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম। কী চেহারাই হয়েছে, একেবারে চেনাই যায় না। কোথায় গেল সেই রঙ? খুব বড়লোকের বাড়িতে বিয়ে হয়েছিল শুনেছিলাম। সে কি তবে এই? না, স্বামীর এত বড় দুর্ঘটনার পর সব সুখে জলাঞ্জলি দিয়েছে! স্বামী তো মারাই যেত। তবু দুটো পায়ের ওপর দিয়ে যে গিয়েছে এ-ও তো যথেষ্ট! তা না হলে এই চেহারার বদলে চরম মর্মান্তিক আর এক বৈধব্যের দৃশ্যই আমাকে দেখতে হতো সেদিন। তার চেয়ে এই-ই ভালো। তবু নিজেদের বাড়িটা ছিল তাই রক্ষে। অন্ততঃ মিনি আশ্রয়ের ব্যবস্থা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে!

মিনিই প্রথম কথা বললে—আপনি কাকে চান?

গলাটা চিনতে পারলাম না। বললাম—আমি এসেছিলাম বাদামতলা থেকে, গোয়ালটুলিতে আমার মামারবাড়ি—

গোয়ালটুলি! ভাবলাম গোয়ালটুলির নাম করলে আর বেশি পরিচয় দিতে হবে না।

কিন্তু হঠাৎ মিনি বললে—কাকে চান আপনি?

কী বলবো বুঝতে পারলাম না। তবু কাকে চাই! আমি যে গোয়ালটুলির লোক! সেই পরিচয়ই তো যথেষ্ট। বললাম—খবরের কাগজে দেখলাম…

মিনি বললে—হ্যাঁ, হঠাৎ হলো, আপনি কি ওঁর সঙ্গে দেখা করবেন? আপনি কি ওঁর আপিস থেকে এসেছেন?

বললাম—তাঁর সঙ্গে তো আমার পরিচয় নেই!

—পরিচয় নেই? তাহলে আপনি কাকে খুঁজছেন?

কী যেন সন্দেহ হলো। বললাম—গোয়ালটুলিতে আপনার বাপের বাড়ি তো?

—গোয়ালটুলি?

মহিলাটি এবার আমার দিকে ভালো করে চাইলেন। বললেন—না তো, আমার বাপের বাড়ি নৈহাটিতে!

নৈহাটি! তবে আমি কি ভুল দেখছি! তবে কে গাড়ি চাপা পড়েছে! কার স্বামী! তবে কি এ মিনি নয়?

বললাম—ডাক্তার হাজরাবাবুকে চিনতেন?

মহিলাটি আরো অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—কোন ডাক্তার?

বললাম—গোয়ালটুলিতে আমার মামারবাড়ির পাশেই যাঁর ডাক্তারখানা ছিল, তাঁর স্ত্রীকে কাকীমা বলে ডাকতাম! আমি গরমের ছুটিতে মামারবাড়ি আসতাম আর খেলা করতাম তাঁর মেয়ের সঙ্গে···

কথা বলতে বলতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখছিলাম। কিন্তু কোনও ভাষাই ছিল না সে-মুখে! আমি এবার থেমে গেলাম।

জিজ্ঞেস করলাম—এটা তো আপনাদের নিজেদের বাড়ি?

মহিলাটি বললেন—না, আমরা ভাড়াটে, আগে শ্যামবাজারে ছিলাম—

—আগে এ-বাড়িতে কারা ছিল?

মহিলাটি বললেন—আগে বাড়িওলারাই ছিলেন, তাঁরা পাশে নতুন বাড়ি তৈরি করে উঠে গিয়েছেন, তারপর আমরা ভাড়া এসেছি, সে-ও প্রায় দু'বছর হলো—

পাশের বাড়িটার দিকে চেয়ে দেখলাম। বাড়িটা বেশ নতুন মনে হলো। নতুন আধুনিক কায়দার। রঙিন কাচের ভেতর দিয়ে আলো এসে পড়েছে বাইরের রাস্তায়। ফিটফাট কেতাদুরস্ত বাড়ি! ভুল করিনি তো! ওই বাড়িটা নয় তো! বারোর দুই-এর এফ বলাই সুর বাই-লেন তো এই বাড়িটাই!

মহিলাটি বললেন—আপনি কি ওঁদের সঙ্গে দেখা করতে চান?

বললাম—আপনি বলতে পারেন ওঁরা গোয়ালটুলির লোক কি না?

—তা হতে পারে, ওঁরা খুব বড়লোক, এ-পাড়ার সব চেয়ে বড়লোক ওঁরা—

বড়লোক! তবে কেন আমি ভাবতে গিয়েছিলাম ওঁরা আমাদেরই সমপর্যায়ে নেমে এসেছে! মিনির সঙ্গে কোন

বড়লোকেরই তো বিয়ে হয়েছিল শুনেছিলাম। মিনির বাবাও তো বড়লোকই ছিল। আমার মামারবাড়ির অবস্থাই ছিল পড়তি! ভালো পাত্র দেখেই মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন হাজরা ডাক্তারবাবু। অবস্থা ভালোই ছিল পাত্রদের, হয়তো সে-অবস্থা আরো ফিরেছে! এ তো আনন্দের কথা! আমি কি তাহলে তার অবস্থা বিপর্যয়ের কথা কল্পনা করে এই শাড়ি এনেছি, এই মিষ্টি, ই ফল এনেছি! মিনির অবস্থা-বিপর্যয়ই কি আমি চেয়েছিলাম মনে মনে? ছি ছি! লজ্জায় বড় কুণ্ঠিত হয়ে পড়লাম। নিজের কাছেই নিজের মুখ দেখাতে সঙ্কোচ হলো! এত নীচ আমি, এত ছোট!

মহিলাটি বললেন—ওই সামনের দরজায় কলিং বেল আছে—টিপুন—

তাড়াতাড়ি সরে এলাম। অন্ধকারে নিজেকে ঢাকতে ইচ্ছে হলো! ভাগ্যিস মিনি আমার এ দুর্বলতা জানতে পারেনি। জানতে পারলে লজ্জা রাখবার যে আর জায়গা পেতাম না!

নিজেকে আড়াল করে নতুন বাড়িটার সামনে গিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। ডাকবো না। কিন্তু হঠাৎ নজরে পড়লো রিক্সাওলাটা আমার ব্যাপার দেখে, কি যেন সন্দেহ করছে। আর কোনও দিকে না চেয়ে সোজা গিয়ে কলিং বেল টিপে দিলাম।

একজন উর্দিপরা বেয়ারা এল। বললে—কাকে চান সাব?

বললাম—মাইজী আছে?

—মেমসাব?

বললাম—বলো গোয়ালটুলি থেকে এসেছি আমি—

বেয়ারাটা আমাকে ভেতরের চেয়ারে বসতে বললো। তারপর র তর করে ভেতরে চলে গেল।

চুপ করে বসে ঘরের চারিদিকে দেখছিলাম। এত ঐশ্বর্য, এত লাস, এতটা তো কল্পনা করিনি! তবে কি আসা ঠিক হয়েছে আমার! না এলেই হতো! আরো দামী শাড়ি আনলেই হতো। আরো কিছু দামী জিনিষপত্র!

হঠাৎ জুতোর আওয়াজ আসতে লাগল! খানিক পরেই চোখকে আর যেন বিশ্বাস করতে পারলাম না। দেখি সিঁড়ি দিয়ে ছে মিনি। আর পেছনে পেছনে তার স্বামী। মিনির সারা

চেহারায় যেন আরো জলুশ। মিনির স্বামীকে দেখেছিলাম বিয়ের রাত্রে। কিন্তু এ যেন অন্য মানুষ। আরো সমৃদ্ধ, আরো বিত্তবান, আরো বিদগ্ধ!

—কে?

আমার কাছে এসেও যেন চিনতে পারলে না মিনি। আমি তার স্বামীকে লক্ষ্য করে হাত জোড় করে নমস্কারের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে উঠলাম।

—কে?

বললাম—আমি গোয়ালটুলি থেকে এসেছি—

—গোয়ালটুলি?

মিনি আরো তীক্ষ্ণ নজর দিয়ে দেখতে লাগল যেন।

বললাম—আমার মামারবাড়ি ছিল আপনাদের বাড়ির পাশে—

এবার যেন চিনতে পারলে মিনি। বললে—ও, তাই বলো—ত আপনি আপনি করছো কেন? কি খবর? কি মনে করে? হঠাৎ?

নিশ্চিন্ত হলাম। তবু রক্ষে চিনতে পেরেছে!

বললাম—যাক, চিনতে পেরেছ তাহলে!

—চিনতে পারবো না, সে কি—এসো, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই—ইনি হচ্ছেন মিস্টার···

ভদ্রলোক শুকনো হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। বললেন—আই সী—

মিনি বললে—তারপর?

বললাম—এই এদিকে এসেছিলাম, তাই—

মিনি বললে—হাতে কী?

কেমন যেন বিব্রত হয়ে পড়লাম। সামলে নিয়ে বললাম—এই, কিছু না—সামান্য···

—ওঃ, শাড়ি মনে হচ্ছে, মার্কেটিং করতে এসেছিলে বুঝি বৌ-এর জন্যে কিনলে?

হঠাৎ বাইরে থেকে রিক্সাওলাটা ডাকলে—বাবু—

দু'জনেই বাইরে চেয়ে দেখলে।

বললাম—ও আমার রিক্সাওলা—

—রিক্সাওলা! রিক্সা দাঁড় করিয়ে এসেছ?

মিনি জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখলে। বললে—ওঃ অনেক জিনিষ কিনেছ দেখছি,...

বললাম—না, একটু কেনা-কাটা করেছিলাম—

মিনি বললে—তা একদিন এসো না, তুমি তো আসোই না আর—

কী বলবো বুঝতে পারছিলাম না। জলটুঙির কথা বলবো নাকি!

মিনি বললে—এসো একদিন বুঝলে, মিস্টার বাসু আর আমি এখনি আবার সিনেমায় যাচ্ছি,—

বললাম—আমি উঠি তাহলে, আর একদিন আসবো—

—হ্যাঁ এসো, সেদিন সব খবরাখবর নেবো, আজ তো ভালো করে কথাই হলো না, এমন সময় এলে...

আমি ততক্ষণে রাস্তায় নেমে পড়েছি। মনে হলো পিঠের ওপর কে যেন সজোরে সপাং সপাং করে চাবুক মারছে। রাস্তায় নামতেই দরজাটা বন্ধ করে দিলে বেয়ারাটা! কানে ভেসে আসতে লাগল শেষ কথাগুলো—হ্যাঁ এসো—তুমি তো আসোই না আর—

রিক্সাওলাটাকে বললাম—চল্ শিগগির—

রিক্সাওলা বললে—বাবু, কোঠি নেহি মিলা?

বললাম—মিলা—

তারপর আবার দাঁড়ালাম গিয়ে বারোর দুই-এর এফ বলাই সুর বাই-লেন-এর বাড়িটাতে। সদরদরজা খোলাই ছিল। তবু দরজার কড়াটা নাড়তে লাগলাম কড় কড় শব্দ করে।

সেই মেয়েটি দৌড়ে এল। আমাকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছে।

বললাম—তোমার মা'কে একবার আবার ডেকে দাও তো—শিগগির—

রিক্সাওলাটা বললে—এই কোঠি বাবু?

বললাম—এই কোঠি!

মহিলাটি আবার এলেন। কিন্তু আমাকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—কী হলো? আবার ফিরলেন যে? ও-বাড়ি নয়?

বললাম—না, ওরা অন্য লোক, ওদের আমি চিনি না—আপনাদেরই আমি খুঁজছিলাম—

মহিলাটি বললেন—কিন্তু আমরা তো গোয়ালটুলিতে···

বললাম—না, আমারই ভুল হয়েছিল, নৈহাটি বলতে গোয়ালটুলি বলে ফেলেছিলাম, এই নিন। আপনার হাতেই দিতে বলেছেন এই জিনিষগুলো···

মহিলাটি যেন আরো অবাক হয়ে গেলেন। বললেন···কী জিনিষ ?

—এই এতে শাড়ি আছে একটা আপনার।

বলে রিক্সাওলাটাকে ডাকলাম—এই রিক্সাওলা—

রিক্সাওলাটা কাছে এল রিক্সা নিয়ে। বললাম—সব চিজ্ উতার দেও।

রিক্সাওলাটা আস্তে আস্তে ফলের ঝুড়ি মিষ্টির চ্যাঙারি নামিয়ে বাড়ির ভেতরে গিয়ে রেখে দিলে।

মহিলাটি বললেন—এসব কী ?

তাঁর তো অবাক হবারই কথা! বললেন—কে ? দাদা পাঠিয়েছে ?

বললাম—হ্যাঁ, এটাতে আম আছে, আর ছেলেমেয়েদের জন্যে কিছু মিষ্টি আছে এতে।

বলে আর দাঁড়ালাম না সেখানে। তাড়াতাড়ি রিক্সাতে উঠে বললাম—জল্‌দি চালাও, জল্‌দি—

ভদ্রমহিলা তখনও বিহ্বল দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়েছিলেন।

তখনও যেন কানে ভেসে আসছে কথাগুলো—হ্যাঁ এসো, তুমি তো আর আসোই না—

রিক্সার ঠুন ঠুন আওয়াজে যেন নেশা আছে। মনে হলো আমারই ভুল হয়েছিল! আমি এবার ঠিক ঠিকানাতেই দিয়ে এসেছি জিনিষগুলো! ঠিক পাত্রেই দেওয়া হয়েছে। নাই বা হলো পরিচিত। নাই বা রইল জানাশোনা! নিজেকেই যেন চাবুক মারতে ইচ্ছে হলো আমার! আমারই তো দোষ! আমি তো ওর ভালো চাইনি! আমি তো ওর ক্ষতিই চেয়েছিলাম মনে মনে। আমি তো চেয়েছিলাম অবস্থা বিপর্যয়ে ওরা আমাদের

সমপর্যায়ে নেমে আসুক! আমাদেরই মতন সাধারণ হয়ে যাক মিনি! মনে মনে তো আমি তাই-ই চেয়েছিলাম! নইলে কেন দুর্মতি হয়েছিল এসব জিনিষ কিনে আনবার! নিউ মার্কেট থেকে দামী আম, বড়-বাজার থেকে দামী মিষ্টি, দামী শাড়ি! এ তো প্রবঞ্চনা! এ-ও তো এক রকম আত্মপ্রবঞ্চনা!

আর মিনিরও দোষ নেই! জলরঙের ছবি কি এতদিন টেকে!

বললাম—তারপর?

জীবনের সব ঘটনার পরে কি তারপর থাকতেই হবে?

বললাম—তারপরে সুরেশ্বরীদিদি কিম্বা মিনির সঙ্গে আর আপনার দেখা হয়নি?

হয়তো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। ভেতর থেকে চাকর এসে ঢুকলো।

বললে—অনেক রাত হয়েছে, মা বলছেন, আপনার খাবার দেওয়া হবে কি?

আমরা কয়েকজন প্রাত্যহিক শ্রোতা। উঠলাম আমরা। আমরা প্রতিদিন সন্ধ্যায় এসে গল্প করি, গল্প শুনি। এ বহুদিনের অভ্যেস আমাদের। কিন্তু এর আগে তো এমনভাবে কখনও তিনি নিজের কথা বলেননি!

আসবার সময় বললেন—কাল এসো আবার, কাল তোমাদের সব প্রশ্নের জবাব দেবো,—আজ শুধু এইটুকু শুনে যাও, সুরেশ্বরী-দিদির সঙ্গে আমার যে-সম্পর্ক ছিল, মিনির সঙ্গেও আমার ঠিক সেই সম্পর্কই ছিল। সেই ছোটবেলা থেকে শুরু করে আমরা সবাই তো বিভিন্ন মানুষের মধ্যে দিয়ে কেবল নিজের জীবনের তৃপ্তিই খুঁজে ফিরছি। কেউ তৃপ্তি খুঁজছি নিজের স্ত্রীর মধ্যে, কেউ পরকীয়ার মধ্যে, কেউ বা বান্ধবীর মধ্যে, আবার কেউ বা প্রতি-বেশিনীর মধ্যে। আসলে আর সবই হলো উপলক্ষ্য, লক্ষ্য শুধু আমাদের জীবনের তৃপ্তি! সেই জীবনের তৃপ্তির দিকটা কি সুরেশ্বরী-দিদি পেয়েছিল? কিম্বা মিনিই পেয়েছিল তার বিবাহিত জীবনে? না আমিই পেয়েছি কখনো? আর পেলেও কি তৃষ্ণা মিটেছে? আর তোমরাও কেউ তৃপ্তি পেয়েছ কিনা তাও ভেবে এসো কাল—এসে বলো আমাকে। আমিও বলবো সেই কাহিনীর বাকী অংশটুকু—

বলতে বলতে যেন চিরদিনের সদাহাস্যময় চেনা মুখটা এই প্রথম দেখলাম অশ্রুভারে চকচক করে উঠেছে!

কিছুক্ষণ তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না। চুপ করে রইলেন। যেন কি ভাবতে লাগলেন।

তারপর বললেন—জীবন আজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমার, পরিপূর্ণ হয়েছে আমার। সবই সত্যি। ধনে জনে ঐশ্বর্যে আমি আজ বিত্তবান, কিন্তু কত জটিল হয়েছে সব! কত কুটিল হয়েছে সব! আজ মনে হয় সেদিন সেই ছেলেবয়সে যতটুকুই পেয়ে থাকি, সেই-ই আমার সত্যিকারের পাওয়া। সেই-ই আমার খাঁটি পাওয়া। তাই আমার বর্তমানের কুটিল-জটিল গোলকধাঁধায় যখনই হারিয়ে যাই আমি, যখনই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ি, তখনই নিষ্কৃতি খুঁজি সেই সব স্মৃতির মধ্যে, সেই ছোটবেলার বাদামতলা আর জলটুঙির অতীতের মধ্যে!

তারপর একটু থেমে বললেন— তা'হলে কাল এসো—কেমন!

আমরা বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম।

বাড়ির দিকে আসতে আসতেও আমরা ভেবেছি। সত্যিই তো, জীবনের তৃপ্তি খুঁজছি তো আমরা সবাই। মানুষের মধ্যে দিয়েই তো তা খুঁজে ফিরছি। কিন্তু এমন একটি লোককেও কি পাবো না যে বলতে পারবে—আমি পেয়েছি! জীবনের তৃপ্তি আমি খুঁজে পেয়েছি! আমার জীবনের সমস্ত প্রীতি একজনকে নিঃশেষে নিবেদন করে দিয়ে নিষ্কৃতি পেয়েছি! আমার আর কিছুর জন্যেই মন কেমন করে না, কারোর জন্যেই আর মন কেমন করে না আমার! এমন লোক কি সংসারে নেই!

ঠিক তারপরদিনই সকালবেলা খবরের কাগজটায় চোখ পড়তেই অবাক হয়ে গেলাম। দেখি সামনের পাতাতেই বড় বড়-করে লেখা রয়েছে—গতকাল মধ্য রাত্রের কিছু আগে স্যার অজয়প্রসাদ মিত্র তাঁর নিউ আলীপুরের নতুন বাড়িতে অকস্মাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর কয়েকঘণ্টা আগেও তিনি নিজস্ব বৈঠকখানায় পরিচিত অভ্যাগতদের সঙ্গে যথারীতি কথাবার্তায় কালক্ষেপ করেন, ইত্যাদি ইত্যাদি...